মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী :
আরবী ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নো'মানী

সহযোগী অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

গবেষক

মোঃ ইসমাঈল হোসেন

এম.ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ

রেজিঃ নং- ৯১/২০১৩-২০১৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

জুন, ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম. ফিল গবেষক জনাব মো: ইসমাঈল হোসেন **"মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী: আরবী ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করেছে। অভিসন্দর্ভটি মৌলিক, তথ্যবহুল ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং গবেষকের একক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতো:পূর্বে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটির পান্ডুলিপি আদ্যোপান্ত ভালভাবে পড়েছি ও দেখেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নো'মানী
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী: আরবী ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এ শিরোনামে ইত:পূর্বে অপর কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

মোঃ ইসমাঈল হোসেন

এম.ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ

রেজিঃ নং- ৯১/২০১৩-২০১৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বাগ্রে আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি ও তাঁর দরবারে জানাই লক্ষকোটি কৃতজ্ঞতা যার অসীম কৃপা ও অনুগ্রহে এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনা করতে পেরেছি। শত কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহামানব, নবীকুল শিরোমনি, বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। সেই সাথে আমি পরম করুণাময় মহান আল্লাহর দরবারে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি, যিনি ইসলামী চিন্তা-চেতনার প্রচার-প্রসারের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং আমৃত্যু লেখা-লেখির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু জামাল মোঃ কুতুবুল ইসলাম নোমানী স্যারের প্রতি, যিনি একজন প্রকৃত গবেষক। তিনি আমার গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন ও বইপত্র, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তিনি শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি সব সময় গবেষণার খোজ-খবর নিতেন। অনেক সময় তিনি আমাকে ফোন করে কাছে ডেকে পরামর্শ দিতেন। কখনো ফোনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতেন। এমনকি গাড়িতে ভ্রমণরত অবস্থায় পরামর্শ দিতে বিরক্তবোধ করতেন না। তিনি অধিকাংশ সময় আমাকে কাছে ডেকে আমার উপস্থিতিতে গবেষণার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ করতেন। তিনি আমার অনেক অস্বচ্ছ উপস্থাপনা ও অজ্ঞত ধারণাকে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করেছেন।

আমার গবেষণা কাজে অনেকের উৎসাহ উদ্দীপনা ও দিক-নির্দেশনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আরবী বিভাগের স্বনামধন্য চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউছুফ। আমি কৃতজ্ঞাতা জানাচ্ছি অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দুকুর রহমান নিজামী, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদির, ড. যুবাইর মোঃ এহসানুল হক, ড. শহীদুল ইসলাম প্রমুখকে। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার প্রিয় স্যার

মোঃ আফাজ উদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী সরকারি কলেজ) এর প্রতি যারা আমাকে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন মূল্যবান সময় নষ্ট করে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে আমার গবেষণা কাজে সহায়তা করেছেন। আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর স্নেহের সন্তান মোসলেহ উদ্দীন সা'দী, মুহিউদ্দীন আল আকবর, জাকিয়া পারভীন, মোরশেদা বেগম ও রাশেদা কাওকাব-এর প্রতি। আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাওলানা কিসমতীর বউমা ও জামাতা ডা. ওয়াহেদুর রহমান, মৌলভী আব্দুর রব ও প্রিন্সিপাল সাব্বির উদ্দিন আহমেদ-এর প্রতি।

এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা মোঃ মজনু আলী ও পরম শ্রদ্ধেয়া মা তাজকেরাতুন কে, যাদের কঠোর পরিশ্রম, অশ্রু ও আন্তরিক দোয়া আমার সকল সফলতার নিয়ামক। মহান আলাহ্ তা'য়ালা আমার মা-বাবা উভয়কে দীর্ঘজীবী করুন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার ছোট ভাই মোঃ ইস্রাফিল আলী, আলী হানজালা, হযরত আলী, মোঃ সোলায়মান আলী, মোসাঃ ঈদন এবং নুসরাত আলী সুমাইয়া-এর প্রতি যাদের আন্তরিক উৎসাহ, পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে।

আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার প্রিয় সহধর্মিনী খাদিজা তানয়িম এর প্রতি, যে সার্বিকভাবে আমাকে সাহস ও উদ্দীপনা দিয়ে সহযোগিতা করেছে।

অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতি যারা বিভিন্ন সময় সেবা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। এছাড়া যেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা থেকে আমি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সে সব লেখকের অবদানও আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোঃ আবদুল্লাহ আল-মামুন ও ওমর ফারুক এর প্রতি যারা অত্যন্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সাথে এ অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে আমাকে সহায়তা করেছেন। আরো যারা আমাকে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা : **১**

প্রথম অধ্যায়

জুলফিকার আহমদ কিসমতীর জীবন পরিক্রমা **পৃষ্ঠা ৪-৩৭**

১ম পরিচ্ছেদ
জন্ম ও বংশ পরিচয়: ৫
২য় পরিচ্ছেদ
শৈশব কাল ৫
৩য় পরিচ্ছেদ
শিক্ষাজীবন ৬
৪র্থ পরিচ্ছেদ
বিবাহ ও পারিবারিক জীবন ১০
৫ম পরিচ্ছেদ
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ১২
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ
কর্ম জীবন ১৮
৭ম পরিচ্ছেদ
অসুস্থতা, ইন্তিকাল, কাফন -দাফন ও মিডিয়া প্রতিক্রিয়া ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবি ,বাংলা ও উর্দু ভাষায় সাহিত্য চর্চা **পৃষ্ঠা ৩৮- ১২৩**

১ম পরিচ্ছেদ
মাওলানা কিসমতীর গ্রন্থ ও পুস্তিকার শ্রেণী বিণ্যাস ৩৯
২য় পরিচ্ছেদ
মাওলানা কিসমতীর গ্রন্থাবলী ৪২
৩য় পরিচ্ছেদ
মাওলানা কিসমতীর গ্রন্থ ও পুস্তিকার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ৫০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জুলফিকার আহমদ কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চা পৃষ্ঠা ১২৪-১৫৬

১ম পরিচ্ছেদ

সংবাদ ও সাংবাদিকতার পরিচয় ১৩০

২য় পরিচ্ছেদ

সাংবাদিকতা তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩২

৩য় পরিচ্ছেদ

সাংবাদিকতার ক্রমবিকাশ ১৩৩

৪র্থ পরিচ্ছেদ

মাওলানা কিসমতীর দৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৩৪

৫ম পরিচ্ছেদ

মাওলানার প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা ১৩৫

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাওলানা কিসমতীর, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ ১৩৯

৭ম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ বেতারে মাওলানা কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চা ১৫২

৮ম পরিচ্ছেদ:

মাওলানা কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চার প্রভাব ও ফল ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী সাহিত্য ও মাওলানা কিসমতী পৃষ্ঠা ১৫৭-১৯০

১ম পরিচ্ছেদ

সাহিত্যের পরিচয় ১৫৯

২য় পরিচ্ছেদ

ইসলামী সাহিত্যের সূচনা ১৬১

৩য় পরিচ্ছেদ

ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু ১৬৬

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামী সাহিত্যের উদ্দেশ্য ১৬৮

৫ম পরিচ্ছেদ

ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ১৭১

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলামী সাহিত্যিক ও ইসলামী গ্রন্থ ১৭৩

৭ম পরিচ্ছেদ

মাওলানা কিসমতী রচিত ইসলামী সাহিত্য ১৭৮

উপসংহার ১৮৬

গ্রন্থপঞ্জি ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

আ.	:	আলাইহিস সালাম
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা. বি.	:	তারিখবিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
রা.	:	রাদিআল্লাহু আনহু / রাদিআল্লাহু আনহুম
সম্পা.	:	সম্পাদিত, সম্পাদনা
সং.	:	সংস্করণ
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি	:	হিজরী সন
ed. /eds.	:	edited by, edition, editor, editions
p.	:	page
pp.	:	pages
pub.	:	published, publication
vol.	:	volume

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কর্মের মাধ্যমে। পৃথিবীতে এমন কিছু মহান ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের নাম শুনলে মনে হয় তাঁরা মৃত নন, তাঁরা জীবিত। তাঁদের কর্ম, চরিত্র ও গুণাবলী অমর হয়ে থাকে। মানুষের স্মৃতিপটে তাঁরা স্থান করে নেন, তাঁরা বেঁচে থাকেন দীর্ঘদিন মানুষের অন্তরে অন্তরে। মরহুম মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সেই সব স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম। যাঁদের নাম স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে মানসপটে ভেসে ওঠে ইসলামী চেতনা ও ইসলামী শিক্ষার স্মৃতি।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। তিনি উন্নত রুচি, মিষ্টভাষী, নিরহংকার ব্যক্তিত্ব, নম্র ও বিনয়ী ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা ও গবেষণার মহান শিক্ষক, সমাজ সংস্কারে আদর্শ সংস্কারক, দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে মশালবাহী পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, সাহিত্যিক, অনুবাদক ও সমাজ সংস্কারক। বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহানবী (সঃ)-এর আদর্শের প্রথম শ্রেণির সৈনিক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতেন। তাঁর বিনয় ছিল ঈষনীয়। প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর নজির ছিল পদে পদে, বক্তৃতায়ও তাঁর বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পেত। তিনি বক্তৃতার সময় আবেগ ও উত্তেজনাহীন অবস্থায় অত্যন্ত সহজ ভাষা ব্যবহার করতেন। কোন বিষয়ে সমালোচনা করতে হলে ভদ্রোচিত যুক্তিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেন। কেউ মনঃক্ষুন্ন হতে পারে এমন কথা তিনি বলতেন না। মানবতার পক্ষে তিনি ছিলেন সর্বদা উচ্চকণ্ঠ, সুদৃঢ় ও আপোসহীন। কারো সাথে মতের অমিল হলে পবিত্র কুরআন, হাদীস দলিল পেশ করার পাশাপাশি তিনি নিজের যুক্তির মাধ্যমে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করতেন। তিনি কারো সাথে কখনো অযৌক্তিক তর্কে লিপ্ত হতেন না।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি গ্রন্থ রচনায় পারদর্শী ছিলেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি বাংলা, উর্দু ও আরবী ভাষার বই-পুস্তক রচনা করে জাতিকে ইসলামি সাহিত্যের এক ভান্ডার উপহার দেন। সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসনের আলোকে উন্নত চেতনাবোধ জাগ্রত করে মুসলিম জাতির ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী প্রায় অর্ধ-শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করে আধুনিক মুসলিম বিশ্বের কাছে তিনি তাঁর জ্ঞানগর্বপূর্ণ

বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি প্রবন্ধ, কলাম ও বহুমাত্রিক সাহিত্য চর্চায় কৃতীত্ব ও অবদান রেখে মানুষের মাঝে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার কাজে ব্রতী হয়েছেন। তিনি পবিত্র কুরআন , হাদীস, সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রবন্ধ বিষয়ক রচনায় সফলতা লাভ করেছিলেন।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী যথেষ্ট সমাজ সচেতন ছিলেন। সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। সভা, সমিতি ও সেমিনার তাঁর দৈনিক কাজকর্মে মিশে থাকতো। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধে সমাজের নানাবিধ কথা ফুটে ওঠেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাঁসি-কান্না, অভিযোগ, প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলো জাতির সামনে তুলে ধরতেন। মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল কর্মকান্ডের যথার্থ বিশ্লেষণে তিনি একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করেছিলেন। বিশ্বের চলমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় ছিলেন সদা সতর্ক। তিনি ছিলেন একজন মহান শিক্ষক। দেশ ও বিদেশে তাঁর এক ঝাক শিক্ষার্থী বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। সংবাদপত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম। সংবাদ পত্রের মাধ্যমে পাঠকমহল কেবল দেশী নয়, বরং বহির্বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, খেলাধুলা ও বিনোদন উপভোগ করে থাকে। জ্ঞান চর্চার সহজ ও আনন্দদায়ক মাধ্যম হল সংবাদপত্র। মাওলানা কিসমতী বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যত বিষয়াদি নিয়েই কলম ধরেছেন, সাংবাদিকতার স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইসলামী দৃষ্টিকোনে তা তুলে ধরতেন। মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সাংবাদিকতা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করে দেশ, জাতি, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে লেখনিকে তাঁর প্রধান পেশা ও নেশা হিসেবে গ্রহণ করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জাতির খেদমত করে গেছেন। তিনি বিরামহীনভাবে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, ফিচার, অনুবাদসহ অসংখ্য লেখা লিখেছেন যা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্যে একটি অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

মোট কথা মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী একাধারে একজন লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক। এমন একজন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ক্ষণজন্মা বিখ্যাত ব্যক্তির কর্ম ও জীবন কথা বাংলা

ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার প্রবল আকাঙ্খা থেকে "মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী: আরবী ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা" শিরোনামে গবেষণার অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করেছি। উল্লেখিত শিরোনামে মাওলানা কিসমতির আরবী ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যাবে বলে আমি আশাকরি।

আমি বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য বোধগম্য ও উপভোগ্য করে উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমার অভিসন্দর্ভটিতে ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ছাড়া ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রায় সব অধ্যায়গুলোর অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদ যথাযথভাবে যুক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী-এর পরিচয়, জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি ৬টি পরিচ্ছেদে বিন্যাস করা হয়েছে। উপসংহার ও তথ্য নির্দেশিকা প্রদান পূর্বক এ অভিসন্দভটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

আমার প্রত্যাশা, এ অভিসন্দর্ভটি আরবী বিভাগের জ্ঞানপিপাসু ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণের জন্য সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চা বিস্তারে মাওলানা কিসমতীর কৃতিত্বের অপর একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেবে যা এতদিন আমাদের নিকট প্রায় অজানা ছিল। তাছাড়াও এই অভিসন্দর্ভটি তাদেরও অনুপ্রেরণা যোগাবে যারা সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা প্রসারে গবেষণা ও পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

এই অভিসন্দর্ভটির তথ্য উপাত্ত মূলত মাওলানা কিসমতীর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, ছাত্র এবং তাঁর উপর প্রকাশিত বিভিন্ন স্মৃতি স্মারক থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমার জ্ঞান ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, স্বভাবজাত ভুলত্রুটি এবং গবেষণার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান সত্ত্বেও এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের দ্বারা পাঠকগণ সামান্যতম উপকৃত হলে নিজের শ্রম সফল ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। মহান আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

মোঃ ইসমাঈল হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর জীবন পরিক্রমা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর জীবন পরিক্রমা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, প্রবীণ সাংবাদিক মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিন উপজেলাধীন কিসমত চলুন্ডা গ্রামে ১৯৩৫ খিষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী সেকান্দর আলী, মাতার নাম জমিলা খাতুন, দাদার নাম মহব্বত আলী এবং নানার নাম সুজাত আলী । প্র-পিতামহের নাম ছিল হেলাল গাজী এবং তার ভাইদের নাম ছিল জালাল গাজী, শমসের গাজী এবং আলাল গাজী । মাওলানা কিসমতীর পিত মৌলভী মুন্সী সেকান্দর আলী ছিলেন সে সময়ের একজন দলিল লেখক ও মসজিদের ইমাম। তিনি সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে চৌদ্দগ্রাম ও লাকসাম থানার ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক (ভেন্ডর) হিসেবে বহু বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, মুন্সী সেকান্দর আলী কৃষ্ণ চলুন্ডা-বারাইপুর গ্রামের ধর্মীয় গুরু ও পীর তুল্য ছিলেন। কেউ পরীক্ষা দিতে যাবে, মাছ ধরতে যাবে কিংবা দূরের কোনো জেলায় যাবে-মৌলভী মুন্সী সেকান্দর আলীর দোয়া নিয়ে যেতেন। এতে তিনি আন্তরিকভাবে সবার জন্য দোয়া করতেন। তিনি ছিলেন ধার্মীক এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তিনি সাধারণ মানুষকে নামাজের নিয়ম-কানুন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দোয়া শিক্ষা দিতেন । তার বিশেষ গুণ ছিল আত্বীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়া। মাওলানা কিসমতী তাঁর পিতা-মাতার চার সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র সন্তান । তাঁর বড় বোনের নাম উম্মে কুলসুম, মেঝো বোনের নাম রোকেয়া বেগম এবং ছোট বোনের নাম হালিমা খাতুন[৪] ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ শৈশব কাল

শিশু জুলফিকার আহমদ কিসমতী গ্রামের সবুজ শ্যামল পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকেন এবং ছোটবেলা থেকেই তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। পিতা তাঁর শিশু সন্তানের মেধা দেখে অত্যন্ত খুশী হন ।

কিসমতী হল তাঁর উপাধি, সার্টিফিকেটে তাঁর নাম হল আবুল কালাম মোহাম্মদ জুলফিকার আহমদ। ১৯৬১ সালে বিশিষ্ট লেখক মাওলানা আবদুল আহাদ কাসেমী এমদাদিয়া লাইব্রেরীতে কর্মরত অবস্থায় তাঁকে কিসমতী উপাধি দেন ।

[২]বাংলাদেশের পীর আওলিয়া সাধক ও ওলামা মাশায়েখদের জীবনী, সম্পা. এ.এস.এম আজিজুল হক আনসারী, সোলেমানিয়া বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা.প্রকাশ, জুলাই,২০১২, পৃ. ৩২৮ ।

[৩] জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী ।

৪)মোসলেহ উদ্দীন সাদী সাক্ষাৎকারে ২৩-০২-১৫ তারিখে এ তথ্য দেন ।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ আমলে কুমিল্লার সদর-দক্ষিন উপজেলার উত্তর ভূলইন ইউনিয়নের হাজত খোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর হাজতখোলা ক্বারীয়ানা মাদ্রাসায় হযরত মাওলানা ক্বারী আলী আহমদ এর কাছে পবিত্র কুরআনের উন্নত তাজবীদ এবং উর্দু ও আরবী ভাষা চর্চা শুরু করেন, এর আগে নিজ গ্রামের ক্বারী আব্দুল মজিদের কাছে তিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেন । মাওলানা কিসমতীর বাবা মুন্সী সেকান্দর আলী আরবী, ফার্সী ও উর্দু কবিতা জানতেন। তাই তিনি তাঁর আদরের সন্তানকে এসব ভাষার প্রাথমিক কিছু ধারণা বাড়ীতেই দেন। যোগ্য পিতা ও শিক্ষকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মেধার স্ফূরণ ঘঠে। ছোট বেলা থেকেই ইসলামী পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী তিনি আয়ত্ত করতে সক্ষম হন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ শিক্ষাজীবন

কুমিল্লার সদর-দক্ষিণ উপজেলার উওর ভূলইন ইউনিয়নের হাজতখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর সে সময়ে কুমিল্লার বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বটগ্রাম হামিদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধিনে দাখিল পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। একই মাদ্রাসা থেকে ১৯৫৫ সালে আলিম পরীক্ষা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন । হাটহাজরি মাদ্রসা থেকে তিনি ১৯৫৭ সালে দাওরা হাদিস পাশ করেন এবং একই বছর বটগ্রাম মাদ্রাসা থেকেই ফাযিল (বর্তমান স্নাতক) পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজীকে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে নিয়ে কৃতকার্য হন। এর পর মাওলানা কিসমতী কুরআন-হাদীসের উচ্চতর শিক্ষার জন্য ঐতিহ্যবাহী ফেনী আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি তাফসিরে বাইজাবী, তাফসিরে কাশ্‌শাফ, আল - ইতকান, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, আনওয়ারুত-তানজিল,ইসলামের ইতিহাস সহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করে ১৯৫৯ সালে কৃতিত্বের সাথে কামিল পরীক্ষায় কৃতকার্য হন |[৭] জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল আগ্রহী মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী কুরআন,হাদীস,আরবী কবিতা, আরবী গদ্য, আরবী অনুবাদ, ইসলামী শরীয়াহ, যুক্তিবিদ্যা, ফারায়েজ, মুসলিম ইতিহাস, বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও তিনি

---

৫) মাওলানা কিসমতীর সহধর্মীণী সাবেরা আফরোজ মজুমদার ০২-০৩-১৬ তারিখে এ তথ্য দেন ।
৬. পারিবারিক সূত্র থেকে সংগৃহীত। মাওলানা কিসমতীর সনদ পত্র অনুযায়ী।
৭. বাংলাদেশের পীর আওলীয়া সাধক ও ওলামা মাশায়েখদের জীবনী,পৃ:৩২৮

বিভিন্ন বষয়ে জানার জন্য আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন । তিনি প্রতিনিয়ত যেখানে যা পেতেন তা পড়ে ফেলতেন। নতুন বই, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী পড়া ছিল তাঁর নেশা। কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি কখনো অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকতেন না ।

জ্ঞানতাপস মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী পড়াশুনার কারণে ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন স্থানে লজিং থেকেছেন। যেমন কুমিল্লার কাশিমনগর মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে হেলাল নগরে এক বছর, বটগ্রাম হামিদিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালে সুলতান পুরে তিন বছর এবং কৃষ্ণপুর সাতঘরিয়া কাজী বাড়ীতে তিন মাস লজিং থাকেন।

ছাত্রাবস্থায় 'আখবারি' উপাধী লাভ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী শিশুকাল থেকেই জ্ঞান পিপাসু ছিলেন। নতুন নতুন বিষয় জানার প্রতি তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন। কুমিল্লার বটগ্রাম মাদ্রাসায় অধ্যায়ন কালে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের বই, পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী পড়তেন। সে সময় মাদ্রাসায় সিলেবাস ভুক্ত বই পড়া ছাড়া অন্য কোন বই পুস্তক পড়া নিষিদ্ধ ছিল। তাই তিনি বই ও পত্র-পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করে বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখতেন যাতে কেউ দেখতে না পায়। দেশ বিদেশের বিভিন্ন খবরা-খবর জানা তাঁর নেশায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর কাছে অপরাপর বন্ধুরা বিভিন্ন বিষয়ের খবর জানতে চাইতো।

এমনকি উক্ত মাদ্রাসার কিছু শিক্ষক মন্ডলীও তাঁকে ডেকে বলতো, "হে আখবারি, আজকের কি কি খবর আছে আমাকে বলো।" এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁকে তাঁর শিক্ষকরা প্রশ্ন করতো। সে সময় তিনি সবার কাছে 'আখবারি' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৮]

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মাওলানা কিসমতী

প্রবীণ সাংবাদিক মাওলানা কিসমতী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যত বিষয়াদি নিয়েই কলম ধরেছেন, সাংবাদিকতার স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির সাথে সাথে তার অন্য একটি বৈশিষ্ট্যও তাতে বিদ্যমান ছিল।

৮.মোসলেহ উদ্দীন সাদী ২০.০২.১৫ তারিখে এই তথ্য দেন।

Dhaka University Institutional Repository

সেটি হলো, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা। ছাত্রজীবনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা দাবির আন্দোলন ছাড়াও তিনিই সর্বপ্রথম এর সমর্থনে কুরআনের (সূরা ইবরাহীমের ৪ নং আয়াত ওয়ামা আরসালা মিররাসুলীন ইল্লা বিলাসানি কওমিহী) উদ্ধৃত করেন এবং ৮০'র দশকে ঢাকার ওসমানী উদ্যানে শিক্ষা সপ্তাহে সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে এ মর্মে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে দেশের বড় বড় বিজ্ঞ লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের তিনি সেদিন ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।

মাওলানার সম্মানিত শিক্ষকদের তালিকাঃ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী নিজ এলাকা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছেন এবং বিখ্যাত অনেক শিক্ষকদের তত্ত্বাবধায়নে শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেছেন। যেমন-

১. মাওলানা আব্দুল হামিদ, মুহতামিম, জামেয়া হামেদিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা,বটগ্রাম,কুমিল্লা ।
২. ক্বারী আলী আহমদ (কুমিল্লা জেলাধীন উজানীর প্রসিদ্ধ ক্বারী হযরত ইব্রাহীম উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিতেন) ।
৩. হযরত মাওলানা আখতারুজ্জামান।[৯]
৪. মাও.এম. ওবাইদুল হক, অধ্যক্ষ, ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা।[১০]
৫. মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী (র.) ।
৬. মাও. মমতাজ উদ্দীন আহমদ, মুহাদ্দিস ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা।
৭. মুহাদ্দিস মাও. হাবিবুর রহমান ।
৮. মাওলানা রমিজ উদ্দীন, বটগ্রাম মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।
৯. মাওলানা আবদুল খালেক হোসাইন, বটগ্রাম মাদ্রাসা, কুমিল্লা।
১০.মাওলানা আঃ মান্নান, মুহাদ্দিস, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা।
১১.মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন, মুহাদ্দিস, ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা।
১২.মাওলানা রমিজ উদ্দীন, বটগ্রাম মাদ্রাসা, কুমিল্লা।
১৩.মাওলানা আবদুল খালেক হোসাইন, বটগ্রাম মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।

এছাড়াও তিনি নিম্মোক্ত বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন।

---

৯. মাওলানা আখতারুজ্জামান, (টঙ্গী পাড়ার হুজুর হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন)। বর্তমানে তিনি জীবিত আছেন। বয়স প্রায় ১১০ বছর। তিনি মওলানা জুলফিকার আহমেদ কিসমতীর খুবই প্রিয় শিক্ষক ।

১০.তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়াতুল মুদাররিসিনের প্রতিষ্ঠাতা জেনেরেল সেক্রেটারি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রাবস্থায় আরবী ভাষার দক্ষতা অর্জন

মাওলানা কিসমতী ছাত্রাবস্থা থেকেই আরবী ও উর্দু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর আরবী ভাষার দক্ষতায় ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সেটি হল তিনি যখন ফাজিল পরীক্ষার সময় ইসলামের ইতিহাস বিষয়টি আরবী ভাষায় উত্তর লিখছিলেন। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে আরবী ভাষায় উত্তর লিখতে দেখে বললেন, তুমি আরবী ভাষায় উত্তর লিখছো? ম্যাজিস্ট্রেট মাওলানা কিসমতীর আরবী ভাষার দক্ষতা দেখে অবাক হলেন। তখন মাওলানা কিসমতী বললো, স্যার জেনারেল বিষয় গুলো তো অন্য ভাষায় লেখা যায়। তাই আমি উর্দু বা ইংরেজিতে না লিখে আরবীতে লিখছি।

মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রান সংস্থার পক্ষ থেকে দাওয়াতে দ্বীনের কাজের জন্যে ০৮-০৮-১৯৯১ হতে ১০-০৮-১৯৯১ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপি মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ কোর্স এ কাটাবন মসজিদ, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকায় অংশ গ্রহণ করেন।

বাইয়াত গ্রহণ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দূরদর্শী আলিম মুসলিম বিশ্ব ও সমকালীন যুগের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব আবুল হাসান আলী আন-নাদভী (র:) ও ব্রাহ্মনবাড়িয়ার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আলিম ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলামের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

একজন আদর্শ ছাত্রের প্রধান দায়িত্ব হলো শ্রদ্ধাভাজন পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের আদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা। মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর শিক্ষক মন্ডলী ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন পারদর্শি ছিলেন তেমনি তাঁর আমলের জীবনেও ছিলেন অতুলনীয় আদর্শ। মাওলানা কিসমতীর জীবনে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল অপরিসীম। শিক্ষকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা, অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্যই ছিল মাওলানা কিসমতীর জীবনে উন্নতি,অগ্রগতি, সফলতা তথা সম্মান ও সুখ্যাতির অন্তরনিহিত কারণ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃবিবাহ ও পারিবারিক জীবন

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ১৯৫৯ সালে কুমিল্লার আব্দুল হাকিম মজুমদার ও রাবেয়া খাতুন দম্পত্তির ১ম কন্যা সাবেরা আফরোজ মজুমদারের সাথে ১ম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১১] তাদের সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবন সুখ ও আনন্দে ভরপুর ছিল। বিদুষী সাবেরা আফরোজ মজুমদার মাওলানাকে সর্বদা সাহস ও উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। মাওলানার পিতার চাচাত বোন সায়েরা খাতুন তার কন্যা মরিয়ম চৌধুরীর জন্য এমন একজন পাত্র খুজছিলেন যিনি তার জায়গা-জমি ও সংসার ভাল ভাবে তত্ত্বাবধায়ন করবেন। তাই ১৯৬৬ সালে কন্যা মরিয়ম চৌধুরীর সাথে কিসমতী সাহেবের ২য় বিবাহের ব্যবস্থা করেন।১২ মাওলানা কিসমতী স্ত্রীর কাছে আদর্শ স্বামী হিসেবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রীর সাথে কখনই রুঢ় ব্যবহার করতেন না। আদর্শ স্বামী হিসেবে তিনি ছিলেন সবার কাছে অনুসরনীয়। যেহেতু মাওলানা কিসমতী তাঁর পিতা-মাতার চার সন্তানের মধ্যে একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন, তাই পিতা-মাতার স্নেহ ও ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রথম। মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী পরিবারের সবার জন্য ছিলেন আদর্শ। সন্তানের নিকট ছিলেন একজন আদর্শ পিতা। স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র তথা পরিবারের সকল সদস্যের সুখ-সা"ছন্দের জন্যে জীবনের শেষ পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি সবাইকে নিয়ে এক সাথে বসবাস করতে ভাল বাসতেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে খাওয়া-দাওয়ায় তিনি পরম আনন্দ পেতেন। পরিবারের সদস্যদের পছন্দ অনুযায়ী বাজার করতেন। বাড়িতে মেহমান আসলে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন এবং তিনি নিজ হাতে মেহমানদের সেবা করতে পছন্দ করতেন। পরিবারের কারো সাথে তিনি কড়া ভাষায় কথা বলতেন না। কোন কারণে কাউকে শাসন করলে পরক্ষনেই আবার তাকে আদর করতেন ।১৩ তিনি ছিলেন দুই ছেলে ও তিন মেয়ের গর্বিত পিতা ।সন্তানদের তিনি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন।

---

১১. প্রগুক্ত

১২. *মাওলানার বড় ছেলে মোসলেহ উদ্দীন সা'দী* ০৫.১০-১৫ তারিখে এ তথ্য দেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মাওলানা ও তার প্রথম সহধর্মিণীর ১ম সন্তান হওয়ার পরে পরপর কয়েকটি সন্তান মারা যায় তাই তিনি ২য় বিবাহ করেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা যায়।

১৩. মাওলানা কিসমতীর জামাই প্রিন্সিপাল সাব্বির উদ্দীন আহমেদ ২৫-০২-১৬ তারিখে এক লিখিত বক্তব্যে এ কথা স্মরন করেন

নিম্নে তাঁর সন্তানদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ

প্রথম সন্তান: জাকিয়া পারভীন। জন্ম: ১০ অক্টোবর, ১৯৬৬। স্বামী: ডা. ওয়াহেদুর রহমান। সন্তান: দুই ছেলে ও এক মেয়ে।

দ্বিতীয় সন্তান: মোরশেদা বেগম। জন্ম: ২৮ নভেম্বর, ১৯৬৮। স্বামী: মওলভী আবদুর রব। সন্তান: তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।

তৃতীয় সন্তান: মোসলেহ উদ্দীন সা'দী । জন্ম: ১০ অক্টোবর, ১৯৭৪। শিক্ষা: বি.এ। কর্ম: ই-কমার্স বিজনেস। তিনি একজন কবি, লেখক, বাংলাদেশ বেতারের ফিচার লেখক ও উপস্থাপক। স্ত্রী: ফাহিমা আখতার। সন্তান: এক ছেলে ও এক মেয়ে।

চতুর্থ সন্তান: মাওলানা রাশেদা কাওকাব। জন্ম: ৩ মার্চ, ১৯৭৬। শিক্ষা: কামিল (হাদীস) ও বি.এ। কর্ম: এম.ডি, বশির মেমোরিয়াল মেডিকেল ও ডায়াগোনিস্টক সেন্টার, আশুলিয়া, ঢাকা। স্বামী: সাব্বির উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা: বি.এ অনার্স ও এম. এ ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম: প্রিন্সিপাল, কর্ডোভা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।

৫ম সন্তান: মহিউদ্দীন আল আকবর, জন্ম: ০১ মার্চ, ১৯৮২। শিক্ষা: কামিল ও বি.এ অনার্স এবং এম. এ অধ্যয়নরত। পেশা: সাংবাদিকতা ।[১৪]

---

১৪. *মাওলানার বড় ছেলে মোসলেহ উদ্দীন সা'দী ০৫.১০১৫ তারিখে এ তথ্য দেন*

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী এক মহানপুরষ। তিনি উন্নত রুচি, গ্রগাঢ় পান্ডিত্য, মিষ্টভাষী, নিরহংকার ব্যক্তিত্ব, বিনয়ী ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সমাজ সংস্কারে আদর্শ সংস্কারক, শিক্ষা ও গবেষণায় মহান শিক্ষক। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে মশালবাহী পথ প্রদর্শক ও মহান আল্লাহর ভয়ের ক্ষেত্রে প্রকম্পিত আত্মার অধিকারী। জাতি, ধর্ম ও বর্ণসহ প্রায় প্রতিটি মানুষের নিকট ছিলেন তিনি অতুলনীয় আদর্শ। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান শিক্ষক, বহুগ্রন্থের প্রণেতা ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। ইসলামী জ্ঞান চর্চাই ছিল তাঁর প্রধান ব্রতী। জীবনের সাধনা ছিল ইসলাম ও মুসলিম জাতির সেবা করা এবং লেখনিকে তিনি তাঁর প্রধান পেশা ও নেশা হিসেবে গ্রহণ করেন[১]। নিম্নে তাঁর কয়েকটি প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য ও গুনাবলি প্রদত্ত হলো:

ক্ষমাশীলতা ও উদারতা

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল অন্তরের অধিকারী তিনি কখনও কাউকে কষ্ট দিতেন না। মাওলানা কিসমতী সারা জীবন আত্মীয়স্বজনসহ সাধারণ মানুষের সেবা করে গেছেন। তিনি সর্বদা সহযোগিতাপ্রবণ লোক ছিলেন। তিনি মানুষকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে ভালোবাসতেন, এমনকি একটি উপদেশ কিংবা সুপরামর্শ দিয়ে হলেও। মানুষকে প্রাণ দিয়ে আপ্যায়ন করতে পছন্দ করতেন তিনি। তিনি অফিসে কিংবা বাসায় সবাইকে নিয়ে একটি ছোট্ট খাবারও খেতে পছন্দ করতেন, এতে তিনি পুলকিত বোধ করতেন। এ থেকে তাঁর জীবনের সরলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই।

[১]. দেশ,জাতি ও ইসলামের সেবক মাওলানা জুলিফকার আহমদ কিসমতী, সাব্বির উদ্দিন আহমেদ, প্রিন্সিপাল, কর্ভোভা ইন্টারন্যাশন্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, রামপুরা, ঢাকা, পৃ.০২

বিনয় ও নম্রতা

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। ছোট-বড়, ধনী-গরীর, পরিচিত-অপরিচিত সকলের সাথে নম্র ব্যবহার করতেন। কোন বিষয় নিয়ে তিনি অহংকার বোধ করতেন না। তিনি শুধু বাংলাদেশের সম্পদই ছিলেন না, বরং তিনি

সমগ্র পৃথিবীর জন্য এক মহা সম্পদ ও মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু নিজের আচার-আচরণে তা কোন সময় প্রকাশ করতেন না।

কৃতজ্ঞতা পরায়ন

একজন কৃতজ্ঞতা পরায়ন মানুষ ছিলেন মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী। তাঁর কেউ উপকার করলে তিনি তা ভুলে যেতেন না। বরং তিনি তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের কাছে অকপটে পুনর্ব্যক্ত করতেন এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তাঁর বিখ্যাত হওয়ার ব্যাপারে যাদের অবদান রয়েছে তাদের কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভায় ও তাঁর লেখনির মাধ্যমে স্বীকার করতেন। তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেন জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন সে জন্য দো'য়া করতেন।

সময়ানুবর্তিতা

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সময়ের প্রতি অত্যধিক গুরত্ব দিতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সহকর্মী মোহাম্মদ এনামূল হক বলেন– বাংলাদেশ বেতারে আরবী অনুষ্ঠানে কর্ম সম্পাদনের জন্য মাত্র (২) দুই ঘন্টা প্রয়োজন হলেও তিনি প্রতিদিন ৪ ঘন্টা সময় দিয়ে কাজের প্রতি এমন দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা ও যথাযথভাবে সম্পাদন করতেন, যার কারণে সহকর্মীগণ তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে কর্মসম্পাদনে যথাযথতা শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে প্রতিদিনকার সংবাদ অনুবাদ করাকালীন সময়ে সংবাদে তথ্য বিভ্রাট, ভাষাগত ভুল, ব্যাকরণগত প্রমাদ, অনুবাদের ক্ষেত্রে

যথাযথ শব্দ নির্বাচন, একাধিক শব্দার্থের মধ্য থেকে নির্বাচন করে যথাযথ শব্দ প্রয়োগ, যথাযথভাবে ১০০% অনুবাদ সম্পাদন করে আরো অতিরিক্ত কাজের সহযোগিতা করে প্রতিদিন শুর্ভ্রবেয়ার্ড নব্ব উর্ধ মহান ব্যক্তিটি রাত প্রায় সারে দশটায় শাহাবাগস্থ বাংলাদেশ বেতার থেকে বেরিয়ে মিরপুরস্থ সাংবাদিক কলোনীর বাসায় যেতেন। সারাদিন পত্রিকা অফিসে লেখালেখির পর মাগরিব নামাজের পর বাংলাদেশ বেতারে এসে মধ্যরাত পর্যন্ত কর্ম সম্পাদন করে বাসা ফিরে যাওয়া ছিল তাঁর প্রতিদিনকার কর্মব্যস্ততা।

অতিথিপরায়নতা

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর বংশগত বৈশিষ্ট্যই ছিল অতিথিপরায়নতা। বাড়িতে মেহমান আসলে তিনি তাদের মর্যাদার সাথে আপ্যায়ন করতেন। তিনি নিজেও মেহমানদের সাথে নিয়ে খেতে পছন্দ করতেন। মেহমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

আত্মত্যাগী

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী আত্মত্যাগী এক মহান পুরুষ ছিলেন। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তিনি আত্মত্যাগের যে সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা মানব জাতির জন্য মূর্ত প্রতীক হয়ে অন্যদেরকে আত্মত্যাগী হওয়ায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগাবে।

বড় হয়ে ওঠার পেছনে ত্যাগই ছিল তাঁর জীবনের মহানব্রত। ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ ও উচ্চাকাঙ্খা তাঁকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারেনি। পার্থিব জীবনের এ সমস্ত লালসা থেকে মহান আল্লাহ তাঁকে মুক্ত রেখেছিলেন। তিনি সাংবাদিকতা ও লেখালেখি করে যে সামান্য উপার্জন করতেন তা দিয়েই সংসার চালাতেন। আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজনকে ঢাকার তাঁর নিজ বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে পড়াশোনার সুযোগ করে দেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ বেতনে চাকুরী পাওয়ার পরও তিনি তা ত্যাগ করে ইসলমের প্রচার ও মানবতার কল্যাণের জন্য কলম সৈনিকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি সংগ্রাম পত্রিকায় কর্মরত অবস্থায়

উচ্চ বেতনে চাকুরীর জন্য দুবাই যান কিন্তু সেখানে মাত্র আড়াই মাস অবস্থান করে দেশে ফিরে এসে লেখা-লেখির কাজে আত্মনিয়োগ করেন[২] ।

মানবতাবাদ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ছিলেন দু:স্থ মানবতার সেবক। তিনি সমাজের গরীব-দু:খী মানুষের সাহায্য করাকে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করতেন। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশি অসুস্থ হলে তিনি তাদেরকে বাড়ি কিংবা হাসপাতালে দেখতে যেতেন, তাদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাদের সেবা করতেন।

আড়ম্বরহীন জীবন যাপন

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, নাম-ডাক ও যশ-খ্যাতির কোন প্রত্যাশা করতেন না। তিনি সব সময় সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি কোন প্রকার বিলাসিতা ও চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না।

ইসলাম ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ইসলাম ও মুসলিম জাতির উন্নয়নের জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং মুসলিম জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর লেখার মাধ্যমে তিনি যুব সমাজকে ইসলাম জানা ও মানার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। যুব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিতেন। ইসলাম ও মানব জাতির উন্নয়নের জন্য তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিতেন। একজন ইসলামী সাহিত্যিকের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী থাকার প্রয়োজন তা তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠেছিল।

[২]. মোসলেহ উদ্দীন সাদী, প্রাগুক্ত,

পরিবারের আদর্শ ব্যক্তি

পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের কাছে তিনি একজন আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। স্ত্রীর কাছে আদর্শ স্বামী হিসেবে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্ত্রীর প্রতি তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ও যত্নবান ছিলেন। তাঁর দুইজন স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কোন দিন কোন বিষয় নিয়ে বড় ধরনের কোন সমস্যা হয়নি। পরিবারের সকল সদস্যের কাছে তিনি একজন আদর্শবান ও অনুকরণীয় ব্যক্তি ছিলেন।

মহানুভবতা

তিনি ছোট বড় সবাইকে সম্মান করতেন। সমাজে তিনি মহানুভবতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। গরীব-দু:খী লোকের পাশে তিনি তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। সকল শ্রেণীর মানুষকে তিনি তাদের যোগ্যতানুযায়ী সম্মান করতেন। তাঁর বড় ছেলে মোসলেহ উদ্দীন সাদী মাওলানা কিসমতীর মহানুভবতার কথা স্মরণ করে বলেন: আমি ছোট বেলায় দেখেছি, আব্বা হুজুর একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন প্রকল্প রিক্সাওয়ালার পা কাঁচে কেটে গেছে। ডাক্তার সেলাই করার কথা বললে রিক্সাওয়ালা সেলাই করতে রাজি না হওয়া আব্বা তাকে বুঝালেন যে সেলাই না করলে ইনফেকশন হবে এবং পরে আরো ক্ষতি হবে। এরপর সেলাই করা হয় এবং পরে সেলাই করা বাবদ আব্বা ডাক্তারকে সে সময়ের ৫০ টাকা দেন। ওখানে উপস্থিত মানুষকে আমি বলতে শুনেছি, তারা বলছিল, মিঞা মাওলানা সাহেব ভাল মানুষ তাই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে আর অন্য কেউ হলে কি নিয়ে আসত ?

.....

২. মোসলেহ উদ্দীন সাদী, প্রাগুক্ত

কুরআন প্রেমিক

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী নিত্য ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। আমলের জিন্দেগীতে তিনি ছিলেন অনন্য। ঝড় বৃষ্টি, তীব্র শীতেও নিয়মিত তিনি মসজিদে জামাতে শরীক হতেন। যা তিনি বিশ্বাস করতেন তা তিনি অকপটে বলতেন। যেটা তিনি করতে পারতেন না, তিনি তা বলতেন না। তিনি স্থানীয় মসজিদে তা'লিমুল কুরআন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর করতেন। তাঁর হাতে বহু বয়স্ক লোক আল-কুরআন সহিহ শুদ্ধভাবে পড়তে শিখেছেন। তিনি কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের ওপর অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা তুলে ধরতেন। যা উপস্থিত মুসল্লিরা তন্ময় হয়ে শুনতেন এবং ভুল ধারণাগুলো নিজেদের মন থেকে বিদায় করতে পারতেন। তাঁর উদ্ভাবিত সহজ পদ্ধতিতে তাজবীদসহ সহীহ্ কুরআন তিনি শিক্ষা দিতেন এবং দর্‌সে হাদীসে রসূল (সা.) এর সহীহ হাদীস বেশ সহজে মানুষদের তিনি বুঝিয়ে দিতে পারতেন। একজন মহান দাঈ ইলাল্লাহ রূপে মাওলানা কিসমতীর মৃত্যুতে এলাকার জনগণ যারা তাঁর কুরআনের তালিম ও তাফসীরের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন তারা আহাজারি করে কেঁদেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ কর্ম জীবন

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর বর্ণিল কর্মজীবন মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ শিক্ষকতার জীবন, দ্বিতীয়তঃ সাংবাদিকতার মাধ্যমে লেখনী জীবন ও তৃতীয়ত সশরীরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে তাবলীগী তথা প্রচারকের জীবন।

তিনি একদিকে ছিলেন জ্ঞান পিপাসু অন্যদিকে জ্ঞান বিতরণে সদা আগ্রহী। মনতোলী সিনিয়র মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে প্রথম শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন[৩]। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে কর্মরত থাকা অবস্থায় অসংখ্য শিক্ষার্থীকে তিনি প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করেছেন যাদের অনেকেই আজ দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ-

১. মাও. লুৎফর রহমান (খোকন), প্রধান মুহাদ্দিস, জিরি মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

২. মাও. মোনায়েম, উপাধ্যক্ষ, কাশিনগর মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

৩. মাও. আবুল কালাম, সহ. শিক্ষক, কাশিনগর মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

৪. মাও. নূরুল হক, অধ্যক্ষ, জোবির কান্দি আলিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

৫. মাও. একরামুল হক, সহ. শিক্ষক, জোবির কান্দি আলিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

৬. মাও, মোঃ আব্দুর রহমান, সহ. শিক্ষক, কালিকাপুর আলিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

৭. মাও. আব্দুল মান্নান, এ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এ্যান্ড অপারেশন ম্যানাজার, এ বি ব্যাংক লিমিটেড।

৮. মাও. আব্দুল বারী, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সফুয়া সফরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

৯. মাও. মোহাম্মদ আইউব আলী, সউদি আরব প্রবাসী।

১০. মাও. আব্দুল কাসেম, প্রভাষক (আরবী), চট্টগ্রাম নজুমিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

---

[৩]. প্রিন্সিপাল সাব্বির উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত

১১. মাও. আবুল খায়ের, প্রভাষক (আরবী), চৌয়ারা আলিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।

১২. মাও. আবুল কাসেম, অধ্যক্ষ, লৌহরী জব্বারিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।

১৩. মাও. আলী হুসাইন, সুপার, উশ্ববিয়া দাখিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।

১৪. মাও. আবুল কাশেম মু. শামসুদ্দীন, অধ্যক্ষ, কৃষ্ণপুর আলিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।

১৫. মাও. আ. রহীম, অধ্যক্ষ, গাঙ্গরা আনোয়ারুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।

১৬. মাও. মনিরুজ্জামান, সহ. শিক্ষক, কনকাপৈত আলিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।

১৭. মওলভী আব্দুর রব, জামাতা, কুমিল্লা ।

১৮. মাও. ইকবাল, শিক্ষক, ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা, ফেনী ।

১৯. মাও. আব্দুস সামাদ, প্রভাষক (আরবী), সুফুয়া সফরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।

২০. মাও. মাকসুদুর রহমান, অধ্যক্ষ, কাচারীপাড়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা ।

২১. মাও. মোঃ ফয়জুল্লা , প্রভাষক (ইসলাম শিক্ষা), কাশিনগর ডিগ্রি কলেজ, কুমিল্লা ।

২২. মাও. বাহার উদ্দীন, শিক্ষক, চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম ।

২৩. মাও. আব্দুল আলিম, পেশ ইমাম, কুমিল্লা টিএনটি মসজিদ, কুমিল্লা ।

২৪. মাও. রুহুল আমীন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গজারিয়া সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা,

প্রমুখ ।

সাংবাদিকতার জন্য ঢাকায় আগমন

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রবীন সাংবাদিক মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সাংবাদিকতা ও সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার আদর্শ প্রচারের ঐকান্তিক আগ্রহের জন্য শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে সাংবাদিতার প্রাণ কেন্দ্র ঢাকায় আসতে উদ্বুদ্ধ হন এবং ১৯৬০ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর ঢাকায় আসেন[৪] ।

সাংবাদিকতার হাতে খড়ি

ঢাকায় এসে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ১৯৬১ সালে সুপ্রসিদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা এমদাদিয়া প্রকাশনা বিভাগে যোগদেন। সেখানেই তিনি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, সাংবাদিক মরহুম মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীর সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর নিকট সাহিত্য চর্চা ও অনুবাদের প্রশিক্ষণ লাভ করেন এখানেই মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সাংবাদিকতার হাতে খড়ি শুরু হয়। এমদাদিয়া প্রকাশনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িয়ে পড়েন[৫] ।

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অধুনালুপ্ত আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্সে বাংলা বিশ্বকোষ বিভাগে কাজ করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ অ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ সোসাইটি ঢাকা কর্তৃক তাঁকে এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ কন্ট্রিবিউশন এওয়ার্ড ২০১০ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়[৬]। সম্মাননা অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী শিক্ষাবিদ, বুদ্দিজীবীদের উপস্থিতিতে মাওলানা কিসমতির হাতে উক্ত সোসাইটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ

[৪]. জনাব আঃ রব, মাওলানা কিসমতীর জামাই ১৫.২.১৫তারিখে এ তথ্য দেন।
[৫] . বাংলাদেশের পীর আওলীয়া সাধক ও ওলামা মাশায়েখদের জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮
[৬]. মাওলানা কিসমতীর ছোট ছেলে মহিউদ্দিন আল আকরব, ৭/১১/২০১৪ তারিখে সাক্ষাতে এ তথ্য দেন।

এনামুল হক সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। এছাড়াও জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা কর্তৃক সদস্য লেখকসম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা কর্তৃক সদস্য লেখক সম্মাননা ২০০৯ এ মাওলানা জুলফিকার আহমেদ কিসমতীকে ভূষিত করা হয়[৭]।

বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে দাওয়াত

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী বিভিন্ন আলিম ও সুধী সমাবেশে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর প্রাণবন্ত বক্তব্য প্রদান করে ইসলামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরতেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজকে গতিময় করতে তিনি তাঁর অনন্য প্রতিভা বাগ্মীতাকে যথার্থ অর্থেই কাজে লাগিয়েছেন। তিনি আরবী, বাংলা, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষার অনর্গল বক্তৃতা দিতেন। মুসলমানদের জীবনে কুরআন হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করতেন। জাতির জন্য কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সম্পর্কহীনতা কত ক্ষতিকর ও ভয়ংকর তা তিনি তাঁর বক্তৃতায় তুলে ধরতেন। বক্তৃতার সময় তিনি কুরআন হাদীসের উদ্বৃতি, কবিতার চরন ও বিখ্যাত মনীষীদের বাণী যথার্থভাবে পেশ করতেন। দার্শনিক যুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখার মাধ্যমে বক্তৃতাকে তেজস্বী করে তুলতেন। তাঁর বক্তৃতার ভাষা ছিল প্রাঞ্জল, সুস্পষ্ট ও আঞ্চলিকতা মুক্ত।

তিনি কুমিল্লার কাশিনগর ঈদগাহ ময়দানে দু'ঈদের নামাজে দীর্ঘদিন যাবত ইমামতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এলাকার মানুষ মাওলানা কিসমতীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ওয়াজ শুনার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতেন বক্তব্যের মাঝে তাঁর বক্তৃতা ছিল প্রাসঙ্গিক ও যুক্তি নির্ভর। অপ্রাসঙ্গিক কোন আলোচনা তিনি করতেন না। তাঁর আলোচনায়

গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁর প্রতিটি কথা তিনি কুরআন ও হাদীসের দলিলের ভিত্তিতে যুক্তিপুর্ণভাবে চমৎকার ভাষায় প্রকাশ করতেন[৮]।

বক্তৃতার সময় মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য উদ্ধৃতি অবলিলায় পেশ করতেন। বিভিন্ন ভাষার গদ্যে-পদ্যে তিনি এতো বেশি উদ্ধৃতি পেশ করতেন যে, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তিনি সন ও তারিখসহ উল্লেখ করতেন। বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্পর্কে তিনি এমন সব দলিল পেশ করতেন,যা সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বহু গ্রন্থ থেকেই কেবল বলে দেয়া সম্ভব।

তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা প্রদান করেছেন যেমন:- ঢাকার পল্টন ময়দান, লালদিঘী ময়দান, ফেনীর মিজান ময়দান এবং পুরান ঢাকার অনেক স্থানে তিনি অসাধারণ বাগ্মীতার প্রমাণ দিয়েছেন[৯]।

কলম সৈনিক হিসেবে মাওলানা কিসমতী

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী দীর্ঘপ্রায় ৫০ বছর লেখালেখি ও সাংবাদিকতার জীবনে দেশ ও জাতির খেদমত করেছেন। বহু প্রকাশনা ও সংস্থায় তিনি লেখালেখি ও গবেষণায় কাজ করেছেন , অনেক জাতীয় পত্র-পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। অনেক জায়গাতে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেছেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি ঈর্ষণীয় সফলতা পেয়েছেন। মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি ২৬ খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন[১০]। অধুনালুপ্ত ঢাকাস্থ নিউইর্য়ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্স এর তত্ত্বাবধানে রচিত ৪ খানা প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষের তিনি উন্নতম লেখক[১১]।

---

[৮]. মোসলেহ উদ্দীন সাদী ৫/১০/১৫ তারিখে এ তথ্য দেন।
[৯]. ড. মো: নুরুল আমিন, সহকারি সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম
[১০]. দৈ. সংগ্রাম, ২ এপ্রিল, ২০১০
[১১]. বাংলাদেশের পীর আওলীয়া সাধক ও উলামা মাশায়েখদের জীবনী, গ্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৯

তিনি বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হয়ে সাংবাদিকতা, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার লেখালেখি, বিভিন্ন ভাষায় মূল্যবান বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য ছিল। আরবী ও উর্দু ভাষা থেকে অনুদিত তাঁর বইয়ের সংখ্যা ৬ খানা[১২]।

তাঁর লেখার মধ্যে স্থান পেত ইতিহাস-ঐতিহ্য , দর্শন, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, মানবাধিকার, ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি ও রূপরেখা, শিক্ষাব্যবস্থা, শিশু ও নারীদের অধিকার, শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও সম্পদশালীদের দায়িত্ব-কর্তব্যসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ। তাঁর লিখিত বইগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হত। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মিজান পাবলিকেশনস, আল- আরাফাহ পাবলিকেশন্স , প্রফেসর পাবলিকেশন্স ইত্যাদি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে তাঁর ১৫০০০ এর অধিক সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ-নিন্ধন প্রকাশিত হয়েছে , যা প্রমাণ করে যে, লেখালেখি ছিল তাঁর পেশা ও নেশা।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অবদান

শৈশবকাল থেকেই তিনি ইসলামী অনুশাসনের মাধ্যমে বেড়ে ওঠেন। শিক্ষা জীবনে তিনি বিভিন্ন বিখ্যাত মনীষীদের সংস্পর্শে আসার কারণে ইসলামী মুল্যবোধ তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে। তিনি ইসলামী শিক্ষাবিদ মরহুম মাওলানা আকরাম খাঁ, মরহুম মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, মরহুম মাওলানা আতহার আলী খান, মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম প্রমুখ মনীষীদের সান্নিধ্যে থাকার মাধ্যমে নিজেকে তাঁদের মত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সরাসরি রাজনীতির সাথে না জড়িয়ে লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করে গেছেন। তিনি সংগ্রাম

[১২]. প্রগুক্ত, পৃ:৩২৯

পত্রিকায় লেখালেখি করলেও জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে তিনি ছিলেন না।[১৩]

তাঁর সহকর্মীবৃন্দ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্ম জীবন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। পরে শিক্ষকতার জীবন ছেড়ে সাংবাদিকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও পাবলিকেশন্সে লেখালেখির কাজ করেন। এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, প্রকাশক, দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদসহ নানা পেশার মানুষের সাথে কাজ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–

১। প্রখ্যাত কলামিষ্ট ও সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরী, (দৈনিক আওয়াজ পত্রিকায় থাকা অবস্থায়)।

২। কবি আল মাহমুদ, দৈনিক সংগ্রাম

৩। কবি ফররুখ আহমদ

৪। কবি আহসান হাবিব

৫। কবি সাজ্জাদ হোসেন খান, সিনিয়র সহকারী সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম।

৬। সালেহ চৌধুরী, সাংবাদিক দৈনিক আওয়াজ।

৭। আনোয়ার জাহিদ, সহ-সম্পাদক , দৈনিক আওয়াজ

৮। অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, প্রথম সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম

৯। আমির খোশরু, সাংবাদিক দৈনিক সংগ্রাম।

১০। মাওলানা আবদুর রহীম , সম্পাদক সাপ্তাহিক জাহানে নও।

১১। মাওলানা মহিউদ্দীন খান, সম্পাদক, মাসিক মদিনা।

১২। গিয়াস কামাল চৌধুরী, ভয়েস অব অ্যামিরিকার বাংলাদেশের সংবাদদাতা

[১৩]. ড. মো: নূরুল আমিন, প্রাগুক্ত

১৩। আবুল আসাদ, সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।

১৪। ড. মো: নূরুল আমিন, সহ-সম্পদক, দৈনিক সংগ্রাম (বর্তমান)।

১৫। অধ্যাপক আবদুল মান্নান খাঁন, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(বাংলাদেশ বেতারের বর্হিবিশ্ব কার্যক্রমের আরবি ভাষার অনুষ্ঠানে মাওলানা কিসমতী তাঁর সাথে কাজ করেন)।

১৬। ড. আবু জামাল মুহাম্মদ কুতুবুল ইসলাম নৌ'মানী, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭। মুফাজ্জল হুসাইন খান, সাবেক পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। মাওলানা কিসমতী বাংলাদেশ বেতারের বর্হিবিশ্ব কার্যক্রমে আমৃত্যু তাঁর সাথে কাজ করেন।

১৮। মোহাম্মদ এনামুল হক, হেড অব এ্যারাবিক প্রোগ্রাম। বর্হিবিশ্ব কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা।

১৯। সালেহ উদ্দীন আহমদ জুহুরী।

২০। জয়নুল আবেদিন আজাদ।

২১। ক্বারী আবদুল মালেক, কাশিনগর মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

২২। ক্বারী আব্দুস সুবহান , কাশিনগর মাদ্রসা, কুমিল্লা।

২৩। মাও. মনিরুজ্জামান, অধ্যক্ষ, চৌদ্দগ্রাম নজমিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

২৪। মাও. আব্দুল কাদির, শিক্ষক কাশিনগর মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

২৫। মাও. আ. বারি, শিক্ষক কাশিনগর মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

সহকর্মীদের মধ্য থেকে তাঁর সম্পর্কে একজনের মূল্যায়ন

মাহাম্মদ এনামুল হক
হেড অব এ্যবারিক প্রোগ্রাম
বহির্বিশ্ব কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা ।

মানুষ তার কর্মের মাধ্যমেই এ জগতে অমরত্ব লাভ করে । আর সেই অমরত্ব লাভের কর্মটি হওয়া চাই রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর ভাষায় সাদকায়ে জারিয়া বা আমলে সালেহ । এমনই এক অমরত্ব লাভের বাস্তব নিদর্শন, গত শতাব্দির অন্যতম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব , প্রবীণ সাংবাদিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন জনাব জুলফিকার আহমদ কিসমতী । যার অনবদ্য ইতিহাস বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন, দেশ,জাতি ও ধর্মের কল্যাণে বুদ্ধিবৃত্তিক খেদমত আজ ফুলে ফলে শুশ্রুভিত হয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কালের সাক্ষি হয়ে যুগের পর যুগ স্বকর্মেই বেঁচে থাকবে ।

এই অমর ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিকই ছিল অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয় । আমি এই মহান ব্যক্তিটির শেষ জীবনের কর্মস্থলের এক প্রতিদিনকার সঙ্গী । কর্মক্ষেত্রে তাঁর একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিকতা, সময়ানুবর্তিতাসহ সকল গুণের অধিকারী আমাদের নিকট আজীবন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন । এই মহান ব্যক্তিটি ধর্মীয় শিক্ষায় একজন উচ্চ শিক্ষিত হয়ে শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে কলম যোদ্ধা বা সৈনিক হয়ে লেখালেখী ও সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন গত শতাব্দির ৫০ এর দশকে । যার হাত ধরে তৈরী হয়েছে এবং সাংবাদিকতার জগতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে হাজারো হাজারো আলেমে দ্বীন যারা আজ লেখালেখি ও সাংবাদিকতার জগতে আলোক বার্তিকা হিসাবে গণ্য ।

স্বাভাবিক ভাবেই লেখালেখি ও সাংবাদিকতার তথ্য জগতের এক বিরাট অংশ রেডিও ও টেলিভিশনও এর অন্তর্ভূক্ত । পাশাপাশি রেডিওতেও একজন কথক হিসাবে ১৯৬৬ সালে অন্তর্ভুক্ত হন । সেই সময় থেকে তিনি পবিত্র কুরআনের সুরা ফুরকানের একটি আয়াতই তাঁর সার্বিক কর্মকান্ডে অনুপ্রেরণা যোগান দেয় আয়াতটি হল- "ওয়া কালার রাসুলু ইয়া রাব্বি ইন্না কাওমী ইত্তাখাজু হা-যাল কুরআনা মাহজুরা" অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর উম্মতের ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আল্লাহ

তায়ালার কাছে অভিযোগ করবেন, যারা কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখি দিয়েছিল অর্থাৎ শুদ্ধভাবে তা পড়েনি, অর্থ বোঝার চেষ্টা করেনি, সে অনুযায়ী আমল করেনি, অন্যের কাছে তা প্রচার করেনি এবং এর বিধানসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেনি। এজন্য তিনি শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই কোরআনের ভাষা আরবী ভালভাবে পড়া ও বুঝার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাই স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দুতাবাস খোলার পরপরই একজন আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ অনুবাদ কর্মকর্তা হিসাবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তার পর থেকেই বাংলাদেশ ও আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর করার লক্ষ্যে একমাত্র রেডিও বাংলাদেশ "বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার"-এর বহির্বিশ্ব কার্যক্রম আরবী ভাষায় প্রচারিত সংবাদ, অনুষ্ঠান, সংবাদ পাঠক ও অনুবাদক হিসাবে প্রাত্যহিক বেতার জীবন শুরু করেন।

স্বাভাবিকভাবে আরবী অনুষ্ঠানের প্রধান হিসাবে আমার অধীনে কাজ করার যেই ঐকান্তিকতা তাঁর মধ্যে অবলোকন করেছি যা বলতে গেলে অসাধারণ। আমার অধীনে তাঁর কাজ ছিল ইংরেজি থেকে সংবাদ অনুবাদ ও পাঠ, সংবাদ পর্যালোচনা, অর্থনৈতিক পর্যালোচনা ও বিশেষ কথিকা অনুবাদ ও সরাসরি পাঠ করা। এই কর্মগুলোতে যেই বিষয়টি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হল সময়ানুবর্তিতা, ঐকান্তিকতা এবং দায়িত্বশীলতা। এই মহান ব্যক্তিটির বাস্তব জীবন ছিল এসব গুণেরই সমাহার।

বাংলাদেশ বেতারে আরবী অনুষ্ঠানে এই কর্ম সম্পাদনের জন্য মাত্র (২) দুই ঘন্টা প্রয়োজন হলেও তিনি প্রতিদিন ৪ ঘন্টা সময় দিয়ে দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতার সাথে যথাযথভাবে কাজ সম্পাদন করতেন, যার কারণে সহকর্মীগণ তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে কর্মসম্পাদনে যথাযথতা শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে প্রতিদিনকার সংবাদ অনুবাদ করাকালীন সময়ে সংবাদে তথ্য বিভ্রাট, ভাষা গত ভুল, ব্যাকরণগত প্রমাদ, অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাযথ শব্দ নির্বাচন, একাধিক শব্দার্থের মধ্য থেকে নির্বাচন করে এপ্রোপ্রিয়েট শব্দ প্রয়োগ, যথাযথভাবে ১০০% অনুবাদ সম্পাদন করে আরো অতিরিক্ত কাজের সহযোগিতা করে প্রতিদিন মহান ব্যক্তিটি রাত প্রায় সারে দশটায় শাহাবাগস্থ বাংলাদেশ বেতার থেকে বেরিয়ে মিরপুরস্থ সাংবাদিক কলোনীর বাসায় যেতেন। সারাদিন পত্রিকা অফিসে লেখালেখির পর মাগরিব নামাজের পর বাংলাদেশ বেতারে এসে মধ্যরাত পর্যন্ত কর্ম সম্পাদন করে বাসা ফিরে যাওয়া ছিল তার প্রতিদিনকার কর্মব্যস্ততা।

জনাব জুলফিকার আহমদ কর্মব্যস্ততার মাঝেও তার খুরধার লেখনিতে সমসাময়িক বিষয়াবলীর ইসলামিক সমাধান, সকল পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন, মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক বিষয়াদি পাঠ্যভূক্ত করা এবং মাদ্রাসা পড়ুয়া যুবকেরা সমাজ জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে যেন অবদান রাখতে পারে তার উপর যুগযুগ ধরে প্রবন্ধ লিখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দিক নির্দেশনা দিয়ে এসেছেন এবং তার লেখা অন্যবদ্য গ্রন্থ আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের (সংগ্রামী) ভূমিকা এবং চিন্তাধারা বইগুলো ভবিষ্যতে যুগযুগ ধরে ঐতিহাসিক অবদান রাখবে।

এই মহান ব্যক্তির কর্ম ও জীবনের উপর যতই গবেষণা হবে ততই জাতি সঠিক দিক নির্দেশনা নিয়ে আলোর পথে পথিক হিসেবে দেশ ও জাতির জন্য বিশেষ অবদান রাখতে পারে। আল্লাহপাক এই মহান ব্যক্তিত্বের কর্মগুলো নেক আমল হিসেবে কবুল করুন। সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে উভয় জাহানে মুক্তির ওয়াসিলা করুন।-আমিন

বাংলাদেশ বেতারে দায়িত্ব পালন

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর করার লক্ষ্যে একমাত্র 'রেডিও বাংলাদেশ' বর্তমানে 'বাংলাদেশ বেতার' এর বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে আরবী ভাষায় প্রচারিত সংবাদ অনুবাদক ও পাঠক হিসেবে বেতার জীবন শুরু করেন। স্বাভাবিক ভাবেই লেখালেখি ও সাংবাদিকতা তথ্য জগতের এক বিরাট অংশ। রেডিও এবং টেলিভিশনও তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তিনি রেডিওতে একজন কথক হিসাবে ১৯৬৬ সালে অন্তর্ভুক্ত হন । তিনি শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই কোরআনের ভাষা আরবী ভালভাবে পড়া ও বুঝার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। যার ফলে সদ্য স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দুতাবাস খোলার পরপরই একজন আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ অনুবাদ কর্মকর্তা হিসাবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর থেকেই বাংলাদেশ ও আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর করার লক্ষ্যে একমাত্র রেডিও বাংলাদেশ "বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার"-এর বহির্বিশ্ব কার্যক্রম আরবী ভাষায় প্রচারিত সংবাদ, অনুষ্ঠান, সংবাদ পাঠক ও অনুবাদক হিসাবে প্রত্যহিক বেতার জীবন শুরু করেন।

সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী তাঁর দীর্ঘ জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন ইসলামিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আলেম ওলামাদের নিয়ে পরিচালিত সংস্থা, ওলামা রাইটার্স গিল্ট" এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং এই সংস্থার সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা শহিদুল ইসলাম ফারুকী

দাওয়াতুল কুরআন বাংলাদেশ এর দায়িত্ব পালন ঃ

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ঢাকার পল্লবীর সাংবাদিক আবাসিক এলাকায় মসজিদুল ফারুকে 'দাওয়াতুল কুরআন বাংলাদেশ' নামে বিশ্বদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত এবং সহজ ও সাবলীল ভাষায় কুরআন ও হাদীসের অর্থ বুঝার জন্য এর কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি নিজে পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত সহীহ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করে মুসল্লিদের শুনাতেন এবং সহজ সরল ভাষায় এর অর্থ বলেও তাফসির করতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এক যুগ ধরে তিনি এ সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানেও কার্যক্রম চালু আছে[১৪]।

ইত্তেহাদুল উম্মাহ এর দায়িত্ব পালন

দেশের বিভিন্ন আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক তথা আলেম সমাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সত্তর দশকের আলেম সমাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি "ইত্তেহাদুল উম্মাহ" প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর নেতৃত্বদানে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। এছাড়াও তিনি ইসলামী সংগ্রাম পরিষদেরও মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন[১৫]।

[১৪]. মাওলানা কিসমতীর ছোট ছেলে মহিউদ্দিন আল-আকবর ৫.১০.২০১৫ তারিখে এ তথ্য দেন।
[১৫]. প্রাসঙ্গিক ভাবনা। মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর স্মরণে, ড. মো: নুরুল আমীন পৃ.৩, প্রিন্সিপাল সাব্বির উদ্দীন আহমেদ

জামিয়াতে তালাবায়ে আরাবিয়ার সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন

বাংলাদেশের মাদ্রাসা ছাত্রদের সার্বিক বিষয়াবলী দেখাশুনার জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা জামিয়াতে তালাবা আরাবিয়ার কেন্দীয় সভাপতি ছিলেন মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন। উক্ত সংস্থার কুমিল্লা ও ফেনী অঞ্চলের সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা কিসমতী। তিনি দীর্ঘ সময় নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।

সদস্য পদ লাভ

বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী কলম যোদ্ধা হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ও বাংলা একাডেমির সদস্যসহ জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ছিলেন।

বিদেশ সফর

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ইরান সরকারের আমন্ত্রনে ১৯৮২ সালে ইরান যান। একই বছরে দৈনিক সংগ্রামে কর্মরত অবস্থায় চাকুরির জন্য ০৬ মাসের ছুটির দরখাস্ত দিয়ে দুবাই যান। সেখানে যাওয়ার পর মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর প্রিয় শিক্ষক ও শুভাকাঙ্খী মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমীকে স্বপ্নযোগে দেখেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'দেশে এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকতে বিদেশে এসেছো কেন?" এরপর মাওলানা মাত্র আড়াই মাস পর দেশে ফিরে এসে আবার সংগ্রাম পত্রিকায় সাংবাদিকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন[১৬]।

হজ্জ্ব পালন

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ১৯৯৫ সালে হজ্জ পালন করেন। এক্ষেত্রে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে হজ্জের সময় অনেক সহযোগিতা পান।

[১৬]. মোসলেহ উদ্দিন সাদী, প্রাগুক্ত,

সপ্তম পরিচ্ছেদ :

অসুস্থতা, ইন্তিকাল, কাফন -দাফন ও মিডিয়া প্রতিক্রিয়া

মাওলানা জুলফিকার আহম্মদ কিসমতী পার্থিব জীবনে লোভ- লালসা ও সুখ-সাচ্ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। কর্মব্যস্ততা ছিল তাঁর প্রতিদিনের সঙ্গী। সারাদিন পত্রিকা অফিসে লেখালেখির পর মাগরিবের নামাজের পরে বাংলাদেশ বেতারে এসে মধ্যরাত পর্যন্ত কর্ম সম্পাদন করে বাসা ফিরে যাওয়া ছিল তার প্রতিদিনের কর্মব্যস্ত তা।

তিনি-২০০৭ সালে প্রথম ষ্ট্রোক করেন[১৭]। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ডায়াবেটিকস, হার্ট ও কিডনি জনিত রোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সে সময় পত্র পত্রিকা ও বেতারে তাঁর সুস্থতা কামনা করে দেশবাসির কাছে দো'আও চাওয়া হয়।

ইন্তিকাল

মৃত্যু এমন একটা বিষয় যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এই বাস্তবতা সবাইকে অবশ্যই মানতে হবে। মানুষ মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু তার স্মৃতি ও কাজের মৃত্যু নেই। মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে। কর্মই তাকে জগতের মাঝে চীর স্মরণীয় করে রাখে। ২০১৫ সালের শেষের দিকে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসুস্থতা বেড়ে গেলে তাঁকে ইউনাইটেড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজধানীর এই হসপিটালে ক্ষনজন্মা, অকুতোভয়, সংগ্রামী ও লড়াকু সৈনিক ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে রাত সাড়ে ৯টায় মহান আল্লাহর ডাকে সাঁড়া দিয়ে না ফেরার দেশে চলে যান। তাঁর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

[১৭]. মোসলেহ উদ্দীন সাদী, প্রাগুক্ত

স্বামী হারা স্ত্রী বাকরুদ্ধ হয়ে যায়, পিতাহারা সন্তানরা দু:খে স্তব্দ হয়ে যায় । লেখক ও আলেম সমাজে নেমে আসে শোকের ছাঁয়া । আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশিরা তাঁর মৃত্যুতে বিশাল শূন্যতা অনুভব করে নিরবে কাঁদতে থাকে ।

নামাজে জানাযা

২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ ফজরের নামাজের পর বাইতুল মোকাররম মসজিদে সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা মিজানুর রহমানের ইমামতিতে মরহুমের বাড়িস্থ ৪নং রোড, সাংবাদিক আবাসিক এলাকা, মিরপুর ১১এ প্রথম নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয় মাওলানার প্রিয় জন্মস্থান কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার উত্তর ভলুইন ইউনিয়নের কিসমত চলুন্ডা গ্রামে । এতে ইমামতি করেন স্থানীয় ইমাম মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ।

তৃতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় কুমিল্লার কাশীনগর কামিল মাদ্রাসার মাঠে । এতে ইমামতি করেন মাওলানা কিসমতীর সুযোগ্য ছাত্র মাওলানার আব্দুল মোনায়েম খান । চতুর্থ জানাযা অনুষ্ঠিত হয় মাওলানার পৈতৃক নিবাস, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের ৪নং শ্রীপুর ইউনিয়নের বাগৈ গ্রাম মোক্তার বাড়ির মসজিদ প্রাঙ্গনে । এতে ইমামতি করেন চট্টগ্রামের জিরি মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা কিসমতীর ভাতিজা ও ছাত্র মাওলানা লুৎফর রহমান (খোকন)

দাফন

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সবার কাছে সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন । মৃত্যুর পর মাওলানার জন্মস্থান, যেখানে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে সেখানে তাঁকে দাফন করার জন্য তাঁর মামাতো ভাই জনাব আ: মতিন, জনাব মোহন মিঞাসহ প্রমুখ ব্যক্তি সেই কিসমত চলুন্ডার দাফন করার জন্য কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করেন । পরে মাওলানা কিসমতীর বড় ছেলে জনাব মোসলেহ উদ্দিন সার্দীর বিশেষ অনুরোধে

মাওলানার পৈতৃক নিবাস কুমিল্লা চৌদ্দ গ্রামের ৪নং শ্রীপুর ইউনিয়নের বাগৈ গ্রাম মোক্তার মসজিদ ও নূরানী মাদ্রসার পাশে পারিবারিক কবরস্থানে দুপুর ৩ টার সময় তাকে সমাহিত করা হয়। (মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, আমিন)

দ্রুত দাফনের কারণ

মাওলানা কিসমতী একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতেন। তাই তাঁর প্রিয় সন্তান ও পরিবারবর্গ মৃত্যুর পর দ্রুত জানাজার ও দাফনের ব্যবস্থা করেন। এ জন্য মাওলানা কিসমতী দীর্ঘ দিনের কর্মস্থল সংগ্রাম পত্রিকা অফিসের জানাজা, বাংলাদেশ বেতারের জানাজা, প্রেস ক্লাবের জানাজা ও বাইতুল মুকাররম এর জানাজা দেয়া হয়নি।

জানাযায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ

১। জনাব আবুল আসাদ, সাম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।

২। ড. ওবাইদুর রহমান, (জসীম) অধ্যাপক পদার্থ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। জনাব আবদুল আওয়াল ঠাকুর, সহ সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব।

৪। কবি সাহিত্যিক সাজ্জাদ হোসেন খান।

৫। মাওলানা গোলাম সিদ্দিকী।

৬। মাওলানা শামসুল হক, খতীব বাইতুর রহমান জামে মসজিদ, কালসি, মিরপুর, ঢাকা।

৭। জনাব, নুরুল হুদা, সভাপতি সাংবাদিক,আবাসিক এলাকা, পল্লবী,ঢাকা ।

৮। জনাব, আমিনুর হক, সেক্রেটারী, সাংবাদিক,আবাসিক এলাকা, পল্লবী,ঢাকা।

৯। জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, হেড অব অ্যারাবিক প্রোগ্রাম, বর্হিবিশ্ব কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতর, শাহবাগ, ঢাকা।

দ্বিতীয় জানাযা

১। প্রফেসর হানিফ।

২। আবদুল মতিন, শিল্পপতি।

৩। আনোয়ার হোসেন, এসিআই গ্রুপের সেলস ম্যানেজার।

৪। ডা. ওয়াহেদুর রহমান।

৫। খলিফা মোখলেসুর রহমান ।

৬। ইব্রাহীম মাস্টার।

তৃতীয় জানাযাঃ

১। মাওলানা আয়াতুল্লাহ নূরী, অধ্যক্ষ, কাশিনগর।

২। মাওলানা কাদির, ধর্মপুর।

৩। মাওলানা এমদাদুল্লাহ।

৪। মাওলানা আবুল কালাম।

চতুর্থ জানাযাঃ

১। মাওলানা নুরুজ্জামান।

২। শাহাদাৎ হোসেন।

৩। সরদার নুরুল ইসলাম।

৪। শামসুদ্দীন।

৫। এমদাদুল হক, সাবেক চেয়ারম্যান।

৬। মাওলানা, শহিদুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সফুয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

৭। মাওলানা আবুল কাসেম, (মাওলানা কিসমতীর) ছাত্র।

৮। মাওলানা মাহবুব ।

৯। মো: আমান উল্লাহ।

১০। মাওলানা নুরুল হক।

ইন্তিকাল পরবর্তী অবস্থা

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মাসকালীন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন। হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাওলানাকে অনেকেই হাসপাতালে দেখতে যান। তাঁর অসুস্থতার কথা মৃত্যুর পুর্ব থেকেই প্রায় সকলের জানা ছিল। তাই তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ চারদিকে অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ইন্তিকাল রবিবার সন্ধ্যা ৯.৩০ হওয়ায় এ সংবাদ রাত্রের মধ্যেই সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়। সকল শ্রেণির মানুষ ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে শেষবারের মত দেখার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসে। যারা আসতে পারেনি তারা তাঁর জন্য মহান আল্লাহর কাছে অশ্রুভেজা নয়নে মাগফেরাত কামনা করে। ফজর নামাজের পর ঢাকার পল্লবী সাংবাদিক এলাকায় একটি নামাজে জানাজা হয়। সেখানে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং ওলামা-মাশায়েখসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অতি দ্রুত চলে আসে। অতপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা,বাংলাদেশ বেতার ফেসবুক পেজে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর শোকবার্তা প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন জায়গা শোকসভা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দো'য়া করা হয়।

জানাজা পরবর্তী অবস্থা

মাওলানা কিসমতীর ছোট ছেলে মতিউদ্দীন আল আকবর বলেন, মামার বাড়িতে জানাজার উপস্থিতে এক ব্যক্তি বলেন, "এই অজ পাড়া গাঁয়ে আগামী ১০০ বছরেও হয়তো এ ধরণের লেখক, বক্তা, ওয়ায়েজ ও সাহিত্যিক হিসেবে আর কেউ জন্ম নিবেনা।"

মহিউদ্দীন আল আকবর আরো বলেন, বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর কুমিল্লার কাশি নগর সংলগ্ন ধর্মপুর ইউনিয়ন এলাকার মেমবার মো: আলকাস বলেন, আমরা যখনই শুনতাম যে মাওলানা কিসমতী ওয়াজের জন্য কোথাও আসবেন, আমরা দ্রুত তাঁর ওয়াজ শুনার জন্য সেখানে ছুটে যেতাম ।

সুধীজনদের মধ্য থেকে তাঁর সম্পর্কে একজনের মূল্যায়ন নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিস্‌মতি

মার দৃষ্টিতে মরহুম মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিস্‌মতি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই ছিলেন না । তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান । একদিকে তিনি ছিলেন দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন অপর দিকে ছিলেন তিনি দেশের অন্যতম মিডিয়া ব্যক্তিত্ব । বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর কলাম সমূহ ছিল অপূর্ব । একজন সফল কলামিষ্ট হিসাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী করণের লক্ষ্যে তিনি অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন ।

বহু প্রতিভার অধিকারী জনাব কিস্‌মতির ছাত্র জীবনে রয়েছে প্রথমত: কওমী এবং পরবর্তীতে আলিয়া নিসাবে শিক্ষা গ্রহণ । ফলে একদিকে আরবী, উর্দু ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তাঁর পান্ডিত্য অন্যদিকে ছিল তাঁর মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ আকায়িদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অগাধ জ্ঞান । আর এখানেই শেষ নয় তার সাথে যুক্ত হয়েছিল আরেকটি বিশেষ দক্ষতা সেটি ছিল তাঁর লিখনি শক্তি । মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তাঁর অনেক বইপত্র প্রকাশনা ছাড়াও তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় লেখালেখি করে গেছেন । যার প্রমাণ আমরা তাঁর কর্মজীবন হতেই লাভ করতে পারি ।

প্রকাশনা ও সাংবাদিকতার জীবনে তিনি তাঁর লিখনীর মাধ্যমে প্রায় ২৬টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন যার মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে, আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের (সংগ্রামী) ভূমিকা, দার্শনিক শাহ্ ওয়ালী উলাহ্ দেহলভী ও তাঁর চিন্তা ধারা, এই সময় এই জীবন, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা, ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্রের অন্তরালে, মানবতা বিধ্বংসী দুটি মতবাদ, আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের পহেলা শহীদ ইমাম হোসাইন । মৌলিক ও গবেষণাধর্মী লিখার পাশপাশি অনুবাদ সাহিত্যেও তাঁর অবদান অনস্বিকার্য্য । তিনি আরবী

ও উর্দু হতে একাধিক গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আল-আহকামুশ শারইয়্যাহর বাংলা অনুবাদ "শরীয়তী রাষ্ট্র ব্যবস্থা", শাহ্ওয়ালী উলাহ্ দেহলভীর "আল-ইনসাফ ফি বায়ানে সাবাবিল ইখতিলাফ" অবলম্বনে লিখিত । রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর প্রকাশিত "আল-মুসলিমুন ফিল ইত্তিহাদীস্ সুফিয়াতী"-এর অনুবাদ "সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমান" ইত্যাদি।

সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ বিস্তার এবং এ বিষয়ে নেতৃত্বদানকারী লোক তৈরীর লক্ষ্যে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে দেশে একটি সময়োপযোগী শিক্ষা কারিকুলাম তৈরী করার জন্য আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর জীবনের এই মহৎ প্রচেষ্টাসমূহ চালানোর ক্ষেত্রে ভাবগুরু হিসাবে যাদের কাছ থেকে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতমহ ছিলেন মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, মরহুম মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, মরহুম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মরহুম মুফতী দীন মুহাম্মদ খান, মরহুম মাওলানা আতহার আলী, মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম, খতীবে আযম মরহুম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ, মরহুম মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মরহুম মাওলানা হাফেজ হাকিম আজীজুল ইসলাম প্রমূখ মনীষীবৃন্দ। তিনি মরহুম কবি আব্দুল মান্নান তালিব সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সম্পাদিত মাসিক মদীনা' পত্রিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৬২ হতে ১৯৬৬ সন পর্যন্ত একদিকে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা "ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্সে" কাজ করতেন, অন্যদিকে অবসর সময়ে সাংবাদিকতা করতেন। তিনি তাঁর প্রকাশনা কর্মকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শে তার প্রকাশিত পুস্তক সমূহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে পুনঃমুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যার ফলে তাঁর দুটো গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের আরবী সার্ভিসে অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করেছেন।

মুফাজ্জল হুসাইন খান

সাবেক পরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

আরবী ,বাংলা ও উর্দু ভাষায় সাহিত্য চর্চা

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

আরবী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় সাহিত্য চর্চা

একটি দেশের অতীত ইতিহাস জানা যায় সে দেশের সাহিত্য ভান্ডার থেকে। যে দেশের সাহিত্য ভান্ডার যত বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হবে সে দেশের জনগণ তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ততবেশি জানতে পারবে। মুসলমানরা প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর এ দেশ শাসন করেছে। এর ব্যাপক প্রভাব ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর পড়েছে। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বহু তাফসীর উর্দু ভাষায় লিখিত হয়েছে। ইসলামী সাহিত্যিকরা বিভিন্ন ভাষা থেকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও প্রভৃতি বিষয়ের অনেক বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। মুসলমানদেরকে ইসলামী ভাবধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ইসলামের প্রতিটি বিষয়কে তাঁরা সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন যার ফলশ্রুতিতে ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডার আজ অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মাওলানা কিসমতীর গ্রন্থ ও পুস্তিকার শ্রেণী বিণ্যাস

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করলেও মূলত: তিনি একজন লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন। লেখা-লেখি ও সাংবাদিকতা ছিল তাঁর নেশা ও পেশা। তাঁর লেখনির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো। তাঁর অসাধারণ লেখনী শক্তি দ্বারা তিনি পাঠক মহলের জ্ঞানের ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোকে আমরা নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যেমন-

১. মৌলিক রচনা
২. অনুবাদমূলক রচনা
৩. সম্পাদিত রচনা
৪. অপ্রকাশিত রচনা

১. মৌলিক রচনাবলীঃ

বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামী সাহিত্যিক মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা ২৬ টি। এই মৌলিক গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে তাঁর ক্ষুরধার লেখনির পরিচয় পাওয়া যায়। কর্মস্পৃহা, সহজ-সাবলিল ভাষার ব্যবহার, দার্শনিক চিন্তাধারা, অগাধ পাণ্ডিত্য, যুক্তি নির্ভর তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর লেখনির মাধ্যমে ফুঁটে উঠেছে। মানব জীবনে প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়ে তিনি কলম ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী আইন, ইসলামী দর্শন, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামে মানবাধিকার, দায়িত্বশীলদের কর্তব্য, লেখক,সাহিত্যিক,বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সামাজিক অপসংস্কৃতি, যুব সমাজের দায়িত্ব, নারী জাতির মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শেখার সময় তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উদ্বৃতি পেশ করেছেন। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ছিল সহজ, সরল ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। পাঠক সমাজের মাঝে তাঁর এই অনবদ্য অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

২. অনুবাদমূলক রচনা

বাংলা, আরবী ও উর্দু ভাষায় দক্ষ মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। অনুবাদ সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন একজন সফল অনুবাদক। তিনি জগৎ বিখ্যাত অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের গ্রন্থ আরবী ও উর্দু ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুদিত ৬টি গ্রন্থ এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর 'আল্-আহকামুশ শরঈয়্যা' এর অনুবাদ করে 'শরিয়তী রাষ্ট্র ব্যবস্থা' নামে পাঠক মহলের কাছে তুলে ধরেছেন। আরবী ও উর্দু ভাষায় রচিত ইসলামী গ্রন্থ থেকে তিনি যে কয়টি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন তা বাংলা ভাষাভাষি জনগণের মনের ক্ষুধা অনেকটা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি সহজ সরল ভাষা বেছে নিতেন। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি শাব্দিক অনুবাদ না করে ভাবানুবাদকে

গুরুত্বারোপ করেছেন যাতে পাঠক সমাজ সহজেই তা বুঝতে পারে। তিনি কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' এর উর্দু অনুবাদকদের অন্যতম

৩. সম্পাদিত রচনা

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সম্পাদনার জগতেও বেশ অবদান রেখেছেন। বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতী নূরুল ইসলামের লেখা 'শ্রেষ্ঠনবী' এর সম্পাদনা করেছেন তিনি। এছাড়াও তিনি রহমত বানু রচিত ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের সমস্যাবলী ও মুক্তির পথ' সহ দাখিল, আলিম ও ফাজিল শ্রেণীর অনেক বই সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলো দেশের অনেক স্বনামধন্য প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. অপ্রকাশিত রচনা

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ষাটের দশক থেকেই সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে তাঁর ১৫০০০ এরও অধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত লেখাগুলো নিয়ে মিজান পাবলিশার্স কর্তৃক 'এই সময় এই জীবন' শিরোনামে প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত দার্শনিক শাহ্ ওয়ালি উলাহ্ দেহলভী (রহ.) এর উর্দু ভাষায় লিখিত বই 'আল ইনসাফ ফি বায়ানে সাবাবিল ইখতিলাফ' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন কিন্তু তা এখনো প্রকাশ হয়নি। এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিসয়ের উপর তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়ে গেছে। আশা করা যায় তাঁর পরিবারবর্গ অপ্রকাশিত লেখাগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে অন্যান্য কর্তৃপক্ষও এগিয়ে আসলে জাতি উপকৃত হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ তাঁর গ্রন্থাবলী

অনুবাদ রচনা (আরবী থেকে অনুদিত গ্রন্থসমূহ)

১. মহানবী (অংশ বিশেষ)

২. উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিতে বর্তমান উপসাগরীয় সংকট (প্রকাশক: ওলামা একাডেমি, ঢাকা, ১৪১১ হি.)

৩. আরব দুনিয়ার সর্বশেষ বিয়োগান্তক ঘটনা ।

উর্দু থেকে অনুদিত গ্রন্থসমূহ

- উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস (অনু.), মূল : ড. প্রফেসর শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, ই.ফা., ঢাকা, ২০০৪
- আদর্শ কীভাবে প্রকাশ করতে হবে, (অনু.), মূল : আবু সালীম মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঢাকা, ১৯৬৪
- মাযহাব সৃষ্টির গোড়ার কথা

মাওলানা কিসমতী রচিত ইসলামী সাহিত্য

তিনি ছিলেন একাধারে একজন লেখক, সাংবাদিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী সাহিত্যিক। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি কলম ধরেছেন। পাঠক সমাজের কাছে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিনি বিভিন্ন বিষয় সহজ ও সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

মাওলানা কিসমতীর ইসলামী সাহিত্যের প্রকারভেদ:

১. ইসলামী ভাবধারা বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্য;

২. ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ ।

১. ইসলামী ভাবধারা বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্য

ইসলামী ভাবধারার প্রবন্ধ সাহিত্যে একজন মুসলিমের আত্মিক ও বৈষয়িক সম্পর্কের প্রতিফলনসহ আত্মা ও বস্তুর অনিবার্য ঐক্যকে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করার এক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ইসলামী ধারার প্রাবন্ধিক স্বীয় প্রবন্ধকে নিরেট উপদেশ ও নির্দেশনায় পরিনত না করে বরং একে নান্দনিকতার সংস্পর্শে হৃদয়গ্রাহী করাসহ ইসলামের শিক্ষা-দর্শন উপস্থাপনে প্রয়াসী হন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি বাংলা ও আরবী ভাষায় বিভিন্ন জায়গাতে প্রবন্ধ উপস্থাপনও করেছেন। তিনি পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ লিখে মুসলিম সমাজে ইসলামী ভাবধারাকে সমগ্র জাতির কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি লেখা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

মাদ্রাসা শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সুস্পষ্ট থাকা কর্তব্য। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের যেই উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরও থাকতে হবে সেই অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এ ব্যাপারে সটিক ধারণা দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র তাদের সম্মানিত শিক্ষকদেরই। এই লক্ষ্য কোনো মদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীর কাছে অস্পষ্ট থাকলে তার পক্ষে কখনো উন্নত আলেম- তথা খাঁটি ধর্মীয় শিক্ষিত ও যথার্থ জ্ঞানী হয়ে গড়ে উঠা সম্ভব নয়। আমরা মনে করি বরং এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মাদ্রাসা শিক্ষায় পরীক্ষা ক্ষেত্রে যেসব ছাত্র-ছাত্রী অন্য ধারার শিক্ষার্থীদের অনুরূপ অবৈধ পন্থায় পরীক্ষা পাস করতে চায়, তারা মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে বহুদূরে অবস্থান করাতেই এই অন্যয় কাজ করতে পারছে। তেমনি যেসব শিক্ষক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকল সরবরাহ করা কিংবা তাদেরকে নকলের সুযোগ দানের অভিযোগ উঠেছে, তারাও এই মহান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তার শিক্ষাদানের মর্যাদার ব্যাপারে চরম বিভ্রান্ত বলেই আমরা মনে করি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ অন্যান্য অর্থকরী শিক্ষার মতো যারা মনে করে, তারাই শুধু নির্লজ্জের মতো পরীক্ষায় এহেন অনৈতিকতার আশ্রয় নিতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য বিরোধী ভাবধারা নিয়ে যেমন সঠিকভাবে এ শিক্ষা আয়ত্তে আনা যায় না, তেমনি একই কারণে সংশিষ্টদের চরিত্রও এ শিক্ষার দাবী মোতাবেক গড়ে উঠে না। আদর্শবান, আল্লাহভক্ত, যোগ্য শিক্ষকই এই মানদণ্ডে মাদ্রাসায় যথার্থ আলেম গড়ে তুলতে সক্ষম। এই মাপের শিক্ষকবৃন্দের দ্বারাই যেমন এ শিক্ষার মান বাড়তে পারে তেমনি তাদের হাতেই গড়ে উঠতে পারে

আদর্শ ছাত্র, যারা কর্মজীবনে সমাজের সকল স্তরে আল্লাহর খলীফা" হিসেবে যথার্থ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম। বলাবাহুল্য, মাদ্রাসার পরীক্ষায় যেসব শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নকল সরবরাহ করেন কিংবা এজন্যে সুযোগ দিয়ে থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে কোনো যথার্থ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের আসনে বসার যোগ্য নন। তাদের দ্বারা যেমন মাদ্রাসা শিক্ষারও মান বাড়তে পারে না, তেমনি তাদের হাতে এ শিক্ষা সুউচ্চ লক্ষাভিসারী যোগ্য আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গড়ে ওঠাও অসম্ভব।

এদেশের জাতীয় ও সাধারণ শিক্ষাঙ্গনে আজ শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিরোধী যেই অশুভ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেই প্রবণতার অভিশাপ থেকে আমাদের জাতীয় শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হলে জাতির সামনে আজ শিক্ষা সম্পর্কীয় যেই আদর্শ স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, সমাজের নেতাদেরকে সেই মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। গোটা জাতিকে তার মনযিলে মাকসুদের দিকে নিয়ে যেতে হলে যেই যোগ্য ও আদর্শ শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তোলা জরুরী হয়ে পড়েছে, সেই কাঙ্ক্ষিত শ্রেণীটি এ দেশের মাদ্রাসা থেকেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এটি তখনই সম্ভব যদি মাদ্রাসা শিক্ষা, এ শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদেরকে আমরা তার যথার্থ লক্ষ্যাভিসারী করে গড়ে তুলতে পারি। দেশের মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয় এই লক্ষ্য পূরণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছাত্র-শিক্ষকরা দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে এলে এ শিক্ষায় সকলের ন্যায় অবাঞ্ছিত কোনো কিছুই স্থান পাবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

ইংরেজ শাসিত অবিভক্ত ভারতে তাদের শাসনের একশ' বছরের মাথায় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার সশস্ত্র বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা ছিল মুসলিম সিপাহীদের যার নেপথ্যে ও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে অনেক মুজাহিদসহ দেশের আলেম সমাজই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। '৫৭'র বিপৰকে চরম জুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে ইংরেজরা দমনে সফলকাম হবার পরম চিন্তা করলো যে, দীর্ঘ ১শ' বছর শাসন করার পরও ভারতের এককালের শাসকজাতি মুসলমান ও তাদের সহযোগীদের ইংরেজ বিরোধী দমন করা যায়নি। সুতরাং এখানে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে ভারতের জনগণ বিশেষ করে মুসলমানরা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও জীবনধারার অনুসারী হয়ে গড়ে উঠে এবং নিজেদের ইসলামী স্বকীয় চেতনা ও মূল্যবোধ থেকে সরে আসে।

ভারত ও বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি বলেন, যেই মুহূর্তে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। ঠিক একই সময় ভারতের মাদ্রাসা বিরোধী অভিন্ন ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে। ভারতের ক্ষমতাসীন উগ্র সাম্প্রদায়িক বিজেপি তার মুসলিম বিরোধী নীল নকশার অংশ হিসাবে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপনের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের উদ্দ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়। এর সূচনা হয়েছে মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উত্তর প্রদেশ থেকে। রাজধানী নয়া দিল্লীসহ ভারতের সর্বত্র মুসলমানরা কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার" - এর এহেন অসৎ উদ্যোগের প্রতিবাদে রাজধানী দিল্লীসহ সারা ভারতে মুসলমানদের বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে প্রকাশ।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এটি মসজিদ মাদ্রাসার দেশ। এখানকার লাখো মসজিদে পাঁচ বেলা লাখো কণ্ঠে আল্লাহরলা শারীক সত্ত্বার শ্রেষ্ঠত্বে ও মহত্বের বাণী উচ্চারিত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এখানকার মাদ্রাসাসমূহে লাখ লাখ ছাত্র লেখাপড়া করে। এসব মাদ্রাসাকে যুগোপযোগী করায় ছাত্র সংখ্যা আরও বাড়ছে। এখানকার রাজনীতি করা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ন্যায় একটি ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের অনুসারী হতে পারে না। মাদ্রাসা বন্ধের বিষয়টি তো এখানে কল্পনাও করা যায় না।

এসব বক্তব্য এবং ভারতে মাদ্রাসা মসজিদ বিরোধী অভিযানের উদ্যোগের পরেও যদি বাংলাদেশের মুসলমানদের চৈতন্য উদয় না হয় যে, দেশটিকে এক শ্রেণীর লোক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, পলাশী যুগে মীর জাফর আলী, উর্মিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায় দূর্লভ প্রমুখ গাদ্দারদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নকালে তৎকালীন সাধারণ মুসলমানদের নীরবতা তাদেরকে যেভাবে দু'শ বছর যাবত পথের ভিখারী করে রেখেছিল, তদ্রুপ আজকের বাংলাদেশী মুসলমানরা দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামের বিরোধীতায় নীরব থাকলে তাদেরকেও একই বরং এর চাইতে কঠিন পরিণতির জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হবে। এ নীরবতা তাদের বংশধরদেরকে বানাতে পারে ব্রাহ্মাণ্যবাদের গোলাম, যা থেকে শত শত বছরেও মুক্তির আশা করা কঠিন।

মাওলানা কিসমতীর নারীদের শিক্ষা, কর্ম ও নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

চাকরি ক্ষেত্র হোক বা অন্যত্র, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজের অন্ধানুসরণে মুসলিম-অমুসলিম সমাজে কেউ তেমন প্রকৃত শান্তির মুখ দেখেনি। কেননা, ইসলাম একটি প্রকৃতি সম্মত ধর্ম। ইসলামী বিধান ও মূল্যবোধ বিরোধী জীবনাচার গ্রহণ মূলতঃ প্রকৃতি বিরোধী কাজ করা, যাতে কিছুতেই সফলকাম হওয়া যায় না। প্রকৃতিরই দাবী হলো, যেসব নারীর জীবনোপকরণের অপর কোন পথ নেই, সেসব নারীর কর্মস্থল এমন হওয়া উচিত, যাতে তাদের সকল প্রকার অধিকার পুরোপুরি রক্ষিত থাকে। এ কারণেই এই ব্যবস্থাকে ইসলামে অপরিহার্য করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ প্রকৃতিবিরোধী এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শুধু নিজেদের সমাজেরই সর্বনাশ করেনি, তাদের দীর্ঘদিনের প্রভাব বলয়ের অন্যান্য সমাজেরও ক্ষতি করেছে। এখন তাদের মধ্যেই যেখানে এর ক্ষতিকর দিকটি আপত্তিকর মনে হচ্ছে এবং এসবকে অপরাধ গণ্য করে এর শাস্তির দাবী করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তো মুসলিম সমাজের এ ব্যাপারে আরও দ্রুত এগিয়ে আসা উচিত। তেমনি প্রসঙ্গত বলতে হয়, পাশ্চাত্য সমাজের নারীরা পর্যন্ত যেখানে নারীর সম্ভ্রম বিনষ্টের প্রতিবাদে ও তা রক্ষায় স্বোচ্চার, সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের নারী সংগঠনগুলোকে এ ব্যাপারে সে তুলনায় নিজেদের স্বকীয়তা, জীবনাদর্শ ও ধর্মীয়মূল্যবোধ রক্ষায় সক্রিয় ও স্বোচ্চার দেখা যায় না। তারা নারী অধিকার নিয়ে কখনও স্বোচ্চার হলেও সেখানে আপন স্বকীয়তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার দিকটি অনেক ক্ষেত্রেই গৌণ থাকে। তাদের এটা জানা উচিত যে, মুসলিম নারীরা নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখেই ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

আজকের মুসলিম নারী সমাজকে জীবনের বাস্তবতার দাবী পূরণ করতে গেলে পশ্চিমের ভোগবাদী জীবন দর্শনের অনুসারী হতে হবে- এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে হবে। যা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এক শ্রেণীর তথাকথিত আধুনিকা প্রগতিবাদী মহিলারা পেশ করেন। বরং নিজস্ব স্বকীয়তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করেই যে জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কঠোর বাস্তবতার মোকাবেলা করা যায়, সেই দৃষ্টান্তই তাওহিদী জনতার এই দেশের নারীদের স্থাপন করতে হবে।

ইসলাম বিরোধী অপসংস্কৃতি সম্পর্কে মাওলানা কিসমতীর প্রবন্ধে নিম্নোলিখিত বিষয়গুলো ফুঠে উঠেছে-

নদর বিন হারিসের ন্যায় আল্লাহ রাসূলের ঘোরতর দুশমনই সর্বপ্রথম বিকৃত চরিত্রের নর্তক-নর্তকী ও গায়িকাদের দ্বারা আল্লাহর দ্বীন থেকে মুসলমানদের বিপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নবগঠিত সমাজের ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হয়েছিলো। অশ্লীল নাচ-গান ও মদ-জুয়ার আসর জমিয়ে মুসলিম যুব মানসের বিকৃতি ও তাদের চরিত্র হননের সে উদ্যোগ নেয়। ইসলামের সাফল্যকে দাবিয়ে রাখা এবং তার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পরই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি মুসলিম যুবকদের আকর্ষণ বিনষ্টের জন্যে নদর বিন হারিস এমনটি করেছিল। সে যেই পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রচার করতো ইসলামের দুশমনদের সেই একই ষড়যন্ত্র একই লক্ষ্যে এখনও যে সক্রিয়, মুসলিম সমাজ নেতৃত্বের অনেকে এখনও তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ বলেই মনে হয়।

মহানবী (সা.) এর মিরাজ সফর শেষে প্রত্যাগমনের পর তাঁর প্রদত্ত এক হাদীস দিয়েই আজকের লেখা সমাপ্ত করছি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এরশাদ করেছেন, আমি মিরাজে গিয়ে দেখেছি, অশ্লীল গানের গায়িকা ও নর্তক-নর্তকীদের চেহারা সম্পূর্ণ কালিমাযুক্ত। তাদের গলায় আগুনের মালা আর তাদের বস্ত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। আর ফেরেশতারা তাদের শাস্তিদান ও ভৎসনা করে চলেছে। মনে রেখো, সকল মানবীয় গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দানের জন্যেই আমি আবির্ভূত হয়েছি। অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিধ্বংসী নৃত্য সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র ধ্বংসের জন্যেই আমার আবির্ভাব।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবন্ধের শিরোনাম নিম্নে দেয়া হলো যেগুলো দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়....

অপরাধ প্রবণতা দূরিকরণে এর শিকড়ে যেতে হবে	[প্রকাশ ঃ ১০. ৪. '৯৮]
"মাদ্রাসা শিক্ষায়ও নকল" এবং কিছু কথা	[প্রকাশ ঃ ১২. ৬. '৯৮]
তালিবান সরকারের কতিপয় ঘোষণা	[প্রকাশ ঃ ১৭. ৭. '৯৮]
সমাজ ধ্বংসে বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্বহীনতা	[প্রকাশ ঃ ২০. ৭. '৯৮ইং]
আফগানিস্তান ঘিরে নতুন সংকট সৃষ্টি না হোক	[প্রকাশ ঃ ৮. ৯. ৯৮ইং]
আফগানিস্তানে শান্তি চুক্তির আলোচনা	[প্রকাশ ঃ ২১. ৩. '৯৯ইং]

অভাবই স্বভাব নষ্টের একমাত্র কারণ নয়	[প্রকাশ ঃ ২২. ৩. '৯৯ইং]
সূর্যসেন যা, তাকে তাই বলা উচিত	[প্রকাশ ঃ ৫. ৫. '৯৯]
'হত্যা অপরাধীর প্রাণদণ্ডে রয়েছে অন্যদের জীবনের নিরাপত্তা'	[প্রকাশ ঃ ২৩. ৭. '৯৯ইং]
"খেলাফতভিত্তিক রাষ্ট্রই জনদুর্গতি লাঘবের উপায়"	[প্রকাশ ঃ ১১. ৯. '৯৯ইং]
কুরআনের আইন বিকৃত করার অপপ্রয়াস!	[প্রকাশ ঃ ১৩. ৯. '৯৯ইং]
'কেসাস' আইনের অনুপস্থিতিই ৬০ খুনের আসামী এরশাদ	[প্রকাশ ঃ ১৮. ৯. '৯৯ইং]
দায়িত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ উক্তি অবিচ্ছিন্ন	[প্রকাশ ঃ ১২. ১১. '৯৯ইং]
তালেবানদের মূর্তি ধ্বংসের প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা	[প্রকাশ ঃ ১৫. ৩. ২০০১ইং]
রমযানের ডাক ঃ ফযীলত ও প্রাসঙ্গিক কথা	[প্রকাশ ঃ ১৭. ১১. ২০০১ইং]
সেই সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া	[প্রকাশ ঃ ২. ১০. ২০০২ইং]
ইরাকের উপর সম্ভাব্য হামলা সুদূরপ্রসারী মার্কিন পরিকল্পনারই অংশ?	[প্রকাশ ঃ ১৫. ১. ২০০৩ইং]
জাতি গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা	[প্রকাশ ঃ ১৭. ১. ০৩ইং]
দত্তদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা রুখতে হবে	[প্রকাশ ঃ ২৬. ২. ২০০৩ইং]
সামূদ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের পরও কি ইরাক বিরোধী যুদ্ধোন্মাদনা থামবে?	[প্রকাশ ঃ ৫. ৩. ২০০৩ইং]
জাতীয় ঐক্যে ফাটল ও তার সুফল ভণ্ডুলের অপচেষ্টা চলছে	[প্রকাশ ঃ ১৩. ৩. ২০০৩ইং]
রাজনৈতিক অঙ্গনের অপসংস্কৃতি দূর হোক	[প্রকাশ ঃ ১৪. ৫. ২০০৩ইং]
জাতিসংঘের প্রতি বুশ-ব্লেয়ারদের বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের নৈপথ্য রহস্যঃ দ্যাগ হেমারশোল্ডকে কেন হত্যা করা হয়েছিল?	[প্রকাশ ঃ ২. ৪. ২০০৩ইং]
আত্মঘাতী হামলা ও বিশ্বনেতৃত্বের ভাববার বিষয়	[প্রকাশ ঃ ২১. ৫. ২০০৩ইং]
বিশ্বময় সৃষ্ট গণ-চেতনাকে এগিয়ে নেয়াই সমস্যা উত্তরণের পথ	[প্রকাশ ঃ ২৮. ৫. ২০০৩ইং]

কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা জরুরী	*[প্রকাশ ঃ ৪. ৬. ২০০৩ইং]*
বিকৃত সন্তানের নির্মম শিকার এবার খোদ মা-বাবাও	[প্রকাশ ঃ ৩০. ৭. ২০০৩ইং]
এক অপরাধের প্রতিবাদে অন্য অপরাধ	[প্রকাশ ঃ ২৩. ৮. ২০০৩ইং]
আরাফাতের বহিস্কৃতি সকল আরব নেতারই বহিস্কৃতির সংকেত	[প্রকাশ ঃ ১৭. ৯. ২০০৩ইং]
একটি নিহত সত্যের পুনরুজ্জীবন ও প্রাসঙ্গিক কথা	[প্রকাশ ঃ১৭. ১২. ২০০৩ইং]
সার্ক-নেতৃবৃন্দের প্রতি একটি মানবিক আবেদন প্রসঙ্গ	[প্রকাশ ঃ ৭. ১. ২০০৪ইং]
নিছক শ্লোগান ও দেহ প্রদর্শনী নারী মর্যাদা নয়	[প্রকাশ ঃ ১৮. ৩. ২০০৪ইং]
ইরাক-আফগানযুদ্ধ মুসলিম নেতাদের চোখ খুলে দিক	[প্রকাশ ঃ ২৩. ৪. ২০০৪ইং]
ইরান সিরিয়া ও সুদান পরিস্থিতি কোন দিকে	[প্রকাশঃ ১১. ১০. ২০০৪ইং]
ইসলাম ও মধ্যপন্থা নীতি	[প্রকাশ ঃ ২৮. ১১. ০৪]

৩য় পরিচ্ছেদ : মাওলানা কিসমতীর গ্রন্থ ও পুস্তিকার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

মাওলানা কিসমতীর গ্রন্থাবলী থেকে স্বল্প পরিসরে কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে সচেষ্ট হবো। এর মধ্যে তাঁর কয়েকটি বই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা না করলেই নয়। নিম্নে তাঁর গ্রন্থাবলীর পরিচয় ও বৈশিষ্টাবলী তুলে ধরা হলো:

❖ চিন্তাধারা

প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।

প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৮; ২য় প্রকাশ: এপ্রিল, ২০০৫।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৯০

বইটির প্রথম অধ্যায় 'ধর্ম ও দর্শন' এর শুরুতেই লেখক বাংলাদেশে ইসলামের আলো, নবী জীবনের আদর্শ বনাম বৈপরীত্য, মহানবী (সা.) এর মি'রাজ গমন, আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের উপায়-উপকরণ, বিজ্ঞান ও কুরআন, ধর্মীয় জীবন ও অসুস্থতা, মাযহাব সৃষ্টির গোড়ার কথা, রমযানের ডাক, কোরবানী, সমাজ সংস্কার ও আলিম সমাজ, শবেবরাত ও পীরভক্তি সম্পর্কে বিশ্বের প্রখ্যাত দার্শনিকদের প্রদত্ত মতামত পেশ করেছেন। অতঃপর তিনি নিজেই তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অতপর মাওলানা সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "ইসলামকে যদি আমরা কিছু বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক কতিপয় কাজই শুধু মনে না করি বরং গোটা মানব জীবনেরই পথ নির্দেশক বলে মনে করি, তাহলে সাহিত্য ও জীবন বর্হিভূত কিছু নয়। সাহিত্য ও জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রকাশের একটি পরিশীলিত মাধ্যম।"[১৮]

এরপর মাওলানা বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে সমাজে অসহায়দের পুণর্বাসন, ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সমস্যাবলী, অপরাধ প্রবণতার সংশোধন, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, সামাজিক অভিশাপ, তালাক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, আজকাল পত্র-পত্রিকায় পাঠক মনকে ভারাক্রান্তকারী খবরের সংখ্যাই বেশি। যেগুলো পাঠে আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থার প্রতি নিজের অলক্ষ্যেই

[১৮] জুলফিকার আহমদ কিসমতী, চিন্তাধারা, পৃষ্ঠা ১২৭।

একটি বিরূপ ধারণার উদ্রেক না হয়ে পারে না। তবে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি খবর শত নৈরাশ্যের মাঝেও যেন আশার হালকা ইঙ্গিত দিয়ে যায়।[১৯]

অতঃপর তিনি চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বকীয় চেতনার উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশীয় শিল্প ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক নাগরিককে স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহিত করতে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি দেশীয় শিল্প মালিকদেরও অসাধু চিন্তাপরিহার করে যেই মানের পণ্য ঠিক সেইমানের মূল্য গ্রহণ করতে বলেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি ইসলামে শ্রমিক ও মালিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বইটির পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি রাজনীতি, স্বাধীনতা, জাতীয় ভাবাদর্শ, ধর্মান্ধতা বনাম ধার্মিকতা, জাতীয় উন্নয়নে গতি সঞ্চার, আধিপত্যবাদের বিরোধিতা, ইসলামী রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও ব্যবস্থা, জিহাদবিমুখ রাখার ইহুদী ষড়যন্ত্র, ধর্মবিরোধী উক্তি, জাতীয় আদর্শের রাজনীতি ও মহিলাদের কর্মক্ষেত্র প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন জাতির আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৈষয়িক তথা তার সার্বিক বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যেই স্বাধীনতা অপরিহার্য।[২০]

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী বইটির ষষ্ঠ অধ্যায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য-মুসলিম বিশ্ব, উপমহাদেশে আফগানদের অবদান, নুহ (আ.) এর জাহাজ, ইসলামী বিচার পদ্ধতি, ইসলামী দণ্ডবিধির সুফল, আত্মকলহ ও জাতীয় বিপর্যয়, যে সুবিচারে অলঙ্কৃত ছিল মুসলিম ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাস, বালাকোটের যুদ্ধ, একটি পর্যালোচনা, মুসলিম দুনিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তুরস্কের ঐতিহ্যময় অতীত, বোমায় ইসলাম মরেনা, সুদানে নিমেরীয় শাসন ও ইসলামী আইন, ইসলামী দুনিয়ার ঐক্য ও বিশ্ব শান্তি, মুসলিম বিশ্বে দুই 'বাদে'র ষড়যন্ত্র, আভ্যন্তরীণ সংঘাতের পটভূমি, পাশ্চাত্যের মানসিক গোলাম তৈরির ষড়যন্ত্র, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, অস্ত্রবলই আসল বল নয়, মুসলমানদের পরমুখাপেক্ষিতার কারণ ও ইসলামের শক্তিবাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১
[২০] প্রাগুক্ত, পৃ.- ৩৪৭

চিন্তাধারা বইটি সম্পর্কে প্রকাশকের মতামত

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও সাংবাদিক মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী দীর্ঘদিন যাবত সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নিয়োজিত রয়েছেন। ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ, মুসলিম উম্মাহ্‌র সমকালীন সংকট ও সংকট উত্তরণের উপায়, জাতীয় জীবনে নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে স্বকীয়তা ও স্বজাত্যবোধ সৃষ্টি, চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে আদর্শিক সংঘাতের স্বরূপ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাশীল লেখনীর মাধ্যমে তিনি অবদান রেখে আসছেন। 'চিন্তাধারা' শীর্ষক গ্রন্থটি তাঁর সে চিন্তা-ভাবনারই ফসল।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

চিন্তাধারা বইটির শুরুতে বাংলাদেশে ইসলামের আলো কীভাবে আসলো সে সম্পর্কে মাওলানা আলোকপাত করে বলেন,সুদূর আরব দেশ থেকে হিমালয়ান উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল- পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত বাংলাদেশে কি করে ইসলামের আলো পৌঁছলো, এরূপ জিজ্ঞাসা যে-কারুর মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। এ জিজ্ঞাসার জবাব সংগ্রহের অনুসন্ধিৎসা থেকেই নিবন্ধের অবতারণা।

বাংলাদেশের সাথে আরবদের সম্পর্ক সেই সুদূর অতীতকাল থেকে বিদ্যমান আছে। এমনকি খ্রিস্ট জন্মেরও বহু পূর্ব থেকে আরব দেশের সাথে দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী এলাকার মাধ্যমে এ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আরবরা বণিকের জাত হিসেবে দূর অতীত থেকেই এই উপমহাদেশের দু'টি উপকূলবর্তী এলাকার সাথে পরিচিত ছিল। পশ্চিম অংশে সিন্ধু এবং দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী এলাকা হয়ে চট্টগ্রাম এলাকার সাথে ছিল তাদের বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

আরবে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটার পর আরব মুসলিম বণিকরা চট্টগ্রাম হয়ে জাভা, সুমাত্রা, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সাথে ইসলামের বাণীও প্রচার করতেন। শেষ নবীর অনুসারীদের মধ্য থেকে অনেকে দেশ-দেশান্তরে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার পর আরব বণিকদের চরিত্রের সততা, সাধুতা, আমানতদারী, সাম্য, সহানুভূতি ইত্যাদি যে সকল মহৎ গুণের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের এই গুণাবলীও সংশ্লিষ্ট বন্দরের অধিবাসীদেরকে তাদের ধর্মমত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তবে হল্যাণ্ডের ওরিয়েন্টালিস্টদের মতে মালদ্বীপসহ ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে এবং বাংলাদেশেও দূর প্রাচ্যের দেশগুলোতে আরব মুসলমানরা নয় বরং তাদের ঐ সকল বংশধর ইসলাম প্রচার করেছে, যারা ভারতীয় উপকূলসহ বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করতো। মালয়েশিয়া, জাভা এবং অন্যান্য অঞ্চলে যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, এ থেকে গুজরাট, মালাবারসহ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহের সাথেও আরব মুসলমানদের সম্পর্ক থাকার প্রমাণ মিলে। চট্টগ্রামের নিকট তখন মুসলিম জনবসতি গড়ে উঠেছিল। চট্টগ্রামের আশেপাশে এবং নিকটতম দ্বীপ সন্দ্বীপে স্থানীয় জনগণের মধ্যে আরবদের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ যেমন কবি আলাওলের লিখিত পাণ্ডুলিপিতে অনেক আরবী বর্ণমালার অস্তিত্ব মিলে। এ সকল আরবী প্রভাব অবশ্যই আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের সৃষ্ট। মূলতঃ মহৎপ্রাণ সাহাবী এবং তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের দ্বারাই সর্বত্র ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। বাংলার এই সবুজ ভুমিও একইভাবে ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়েছে।

ইসলামী দাওয়াত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেন,দাওয়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে আহ্বান করা। যে আহ্বানের মাধ্যমে একমাত্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং তাঁকেই মানব জীবনের সকল বিভাগের উপাস্য এবং আইন ও বিধানদাতারূপে মেনে নেয়া হয় আর সকল গায়রুল্লাহর দাসত্ব-আনুগত্যকে অস্বীকার করা হয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহর রাসূলরূপে স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান থাকে, তাকেই ইসলামী দাওয়াত বলা হয়।

যিনি বা যাঁরা ইসলামী দাওয়াতের মহান দায়িত্ব আনজাম দেবেন, তাঁদের বলা হয় 'দায়ী ইলাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পথের আহ্বায়ক। 'দায়ী ইল্লাল্লাহ' তথা আল্লাহর পথে যারা মানুষকে আহ্বান জানান, তাঁদের মর্যাদা অতি উচ্চে। খোদ আল্লাহ তায়ালা ইসলামী দাওয়াতের দায়িত্ব পালনকারীদের প্রশংসা করে বলেছেনঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ("ঐ ব্যক্তির চাইতে সুন্দরতম উত্তম বক্তব্যের অধিকারী আর কে, যে (মানুষকে)আল্লাহরপথে আহ্বান জানায় এবং সৎকর্ম করে, আর এই বলে ঘোষণা দেয় যে, আমি একজন মুসলমান।"[২১]

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামী দাওয়াতের প্রয়োজন কেন? এ দাওয়াত না দিলে অসুবিধা কোথায়? এ প্রশ্নের এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর এবার আলোকপাত করা যাক।

মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। তার পক্ষে জ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা দ্বারা অপর মানুষের পূর্ণ ও নিরপেক্ষ কল্যাণ-চিন্তা সম্ভব নয়। এ কারণেই দেখা যায়, মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে মানব রচিত সকল বিধি-ব্যবস্থা বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বরণ করে কিংবা স্থায়ী সুফল আনয়নে সক্ষম হয় না। কিছুকাল পরপরই সে বিধান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মানুষের উদ্ভাবিত আইন ও বিধানের দ্বারা এক শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ সাধিত হলেও তাতে অপর শ্রেণী হয় বঞ্চিত, শোষিত।

সুতরাং মানব জাতির শান্তি ও কল্যাণ বিধানে মানব-দর্শন ও মানব রচিত বিধি-বিধানের এই চিরন্তন ব্যর্থতাই দাবি করে যে, মানুষের জন্যে এমন এক জীবন-দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা আবশ্যক, যা তাদের বস্তুগত ও পারলৌকিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান দেবে এবং নিশ্চিত করবে তাদের সার্বিক কল্যাণকে। বলাবাহুল্য সেটি একমাত্র মানবজাতির ও সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রতি দ্বিধাহীন চিত্তের আত্মসমর্পণ ও তার অবতীর্ণ বিধানের পূর্ণ অনুসরণের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত সর্বশক্তিমান স্রস্টাই জানেন মানুষ কিরূপ চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা শান্তির অধিকারী হতে পারে। এ কারণেই তিনি তা নির্দেশ করে ইরশাদ করেছেন: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ "ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান।[২২] .....ইসলাম ছাড়া জীবন ব্যবস্থা হিসাবে যারা অপর কিছু তালাশ করবে, তা কখনও গ্রাহ্য হবে না।"মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেছেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً "তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।"[২৩]

খণ্ডিতভাবে আল্লাহর বিধান মেনে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশা বৃথা, তাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেরণের বর্ণিত উদ্দেশ্য-লক্ষ্যে দেখা যায়, এ বিধানকে পরিপূর্ণভাবে মানব সমাজে বাস্তবায়ন

[২১] সূরা হা-মিম, সাজদাহ, আয়াত: ৩৩
[২২] সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৯
[২৩] সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২০৮

করাই হচ্ছে তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেন: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ "পথ নির্দেশক বিধি-ব্যবস্থা এবং সত্য দ্বীন তথা যথোপযুক্ত জীবন-ব্যবস্থা দ্বারা তাঁর রাসূলকে এজন্যেই আল্লাহপ্রেরণ করেছেন, যেন তিনি (মানব রচিত) সকল বিধি ব্যবস্থার উপর আলাহর দ্বীনী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন- যদিও এটা মুশরিক-অবাধ্য মানুষেরা খারাপ জানবে।[২৪]

সুতরাং এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য, যে জন্যে মহানবী (সা.) আপোসহীন সংগ্রাম করে গেছেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে সম্পদ ও প্রাণহানিসহ যাবতীয় ত্যাগ ও পরিশ্রমকে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তরণের এবং অপরাধ মাফ পাবার ও বহু কাঙ্ক্ষিত জান্নাতে প্রবেশাধিকারের পূর্বশর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, সূরা সফ-এ বর্ণিত আছে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (তা হলো) আল্লাহর এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনা আর আল্লাহর পথে মাল এবং জান দিয়ে 'জিহাদ' করা। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে পার। তবেই তোমাদের ক্ষমা করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে, যার পাদদেশ হয়ে প্রবাহিত হয়েছে নদ-নদী সমূহ।"[২৫]

স্থিরচিত্তে ইসলামের দাওয়াত দেয়া প্রসঙ্গে মাওলানা কিসমতী বলেন,আল্লাহপাক বলেছেন: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا "(হে মুহাম্মদ!) আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন সর্বোত্তম ভাবে কথা বলে। আসলে শয়তান তাদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।[২৬]

---

[২৪] সূরা সফ, আয়াত: ৯

[২৫] সূরা সফ, আয়াত: ১০-১২

[২৬] সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫৩

যেমন আল্লাহ বলেছেন :وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى.فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى "(হে নবী!) আমি তোমাকে সহজ পন্থার অনুমতি দিচ্ছি, কাজেই তুমি উপদেশ দিয়ে যাও- যদি উপদেশে ফায়েদা হয়।"[২৭] অর্থাৎ অন্ধদেরকে পথ দেখানোর দায়িত্ব তোমার নয়। তোমাকে একটা সহজ পন্থা দিয়ে দিচ্ছি তা হলো, তুমি উপদেশ দান করতে থাকো: যতক্ষন তুমি অনুভব করতে থাকবে যে, কেউ না কেউ এর দ্বারা উপকৃত হতে প্রস্তুত। বাকি থাকলো, এর দ্বারা কে উপকৃত হতে প্রস্তুত, কে প্রস্তুত নয়। এটা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। মূলতঃ আহ্বায়কের কাজ হলো উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত লোকদের খুঁজে খুঁজে বের করা।

আল্লাহবলেন: "(হে নবী!), যারা রাতদিন নিজের প্রভুকে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় থাকে, তুমি তাদের দূরে সরিয়ে দিও না। তোমার উপর তাদের হিসাবের কোন দায়-দায়িত্ব নেই; আর তাদের উপরও তোমার হিসাবের কোন যিম্মাদারী নেই। তারপরও যদি তুমি তাদের দূরে সরিয়ে দাও তবে তুমি জালিমদের দলভূক্ত হবে।"[২৮]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সংস্থা ও সংগঠনই আজকাল কিছু কিছু দাওয়াতী কাজ করছে। কিন্তু এদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য সহযোগিতার তীব্র অভাব লক্ষ্যনীয়। এ মনোভাব দূরীভূত না হলে আমাদেরকে অনৈক্যের স্বাভাবিক ধর্ম হিসাবে দুর্বলতা গ্রাস করে রাখবে। তাই আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন:وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا "তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু (কুরআন তথা ইসলাম)-কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[২৯]

সত্যের দাওয়াতের বিরোধিতা সম্পর্কে মাওলানা কিসমতী বলেন, মানব মনের প্রতি বাতিল ও অসত্যের হাতছানি যেমন চিরন্তন, তেমনি সত্যের দাওয়াতের বিরোধিতাও একটি চিরন্তন ব্যাপার। ন্যায় ও সততা চিরকাল বিরোধিতার মধ্য দিয়েই স্থায়িত্ব লাভ করে। সত্যকে অসত্যের বিরোধিতার সম্মুখীন হতেই হয়। বিরোধিতা না হলে বুঝতে হবে তাতে কোথাও না কোথাও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাতিলের সাথে আপোস ও মিতালি রয়েছে। সত্য প্রথমেই সার্বিকভাবে গৃহীত হতে চায় না। কারণ সত্য গ্রহণে ত্যাগের স্পৃহার প্রয়োজন। চরিত্রে ও মন-মস্তিষ্কে মহৎ কিছু গ্রহণ করতে হলে সেখানে অনেক কিছু ছাড়তেও হয় বৈকি। ছাড়ার প্রশ্নটাই বড় প্রশ্ন। এটাকেই মহৎ আলোচনায় 'ত্যাগ' বলা

[২৭] সূরা আ'লা, আয়াত: ৮-৯
[২৮] সূরা আন'আম, আয়াত: ৫২
[২৯] সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১০৩

হয়। সত্যকে গ্রহণের পথে যে সব জিনিস পরিতাজ্য তথা যেগুলো ছাড়তে হয়, সেগুলো অনেক প্রকারের হতে পারে- আর্থিক স্বার্থ, যশ-খ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা, বিলাসী মনের উদ্যম প্রবণতা, প্রিয়বস্তু বা প্রিয়জনের বিচ্যুতি, মজ্জাগত বদভ্যাস ইত্যাদি। এছাড়া আরেকটি জিনিসও সত্য গ্রহণে প্রধান বাঁধা হয়ে থাকে। সেটা হলো একবার যে বিষয় সম্পর্কে সত্য বলে বদ্ধমূল ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা থেকে বিচ্যুতির আশঙ্কা।

এই উপমহাদেশেও ইসলামী দাওয়াত ও মুসলিম উম্মাহর অনেক মহৎ পদক্ষেপ ছদ্মবেশী কুচক্রীদের দ্বারা বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে। ফলে একদল আরেক দলের জানী দুশমনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কুচক্রীদের স্বরূপ পরে ধরা পড়লেও তখন জাতি-ধর্মের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়ে গিয়েছিল। তেমনিভাবে আজও ইসলামী দাওয়াতী কাজের উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে এ মহান কাজের পৃষ্ঠে ছুরি চালাবার নানান প্রকার ষড়যন্ত্র চলা অসম্ভব কিছু নয়। এই উপমহাদেশে যখন এক শ্রেণীর লোক নিঃস্বার্থভাবে রাজনীতির অঙ্গন, শিক্ষাঙ্গন ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন, তখন ইসলামের দরদী বলে দাবিদার আরেকটি শ্রেণীর দ্বারাই তাদের মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বানচালের চেষ্টা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর ইঙ্গিতে তাদের তল্পিবাহী শ্রেণীটি ঐ সকল বুযুর্গের চতুষ্পার্শ্বে ভিড় জমিয়ে চতুরতার সাথে ইসলামী শক্তিকে খর্ব করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। ফতোয়ার অস্ত্রও কম নিক্ষিপ্ত হয়নি। আমাদের এদেশসহ দুনিয়ার কোন মুসলিম ভূখণ্ডেই যাতে কোন ইসলাম দরদীর এহেন 'ইখলাস ও সরলতা' ইসলামের জন্যে কর্মরত কোন ইসলামী দলের জন্যে ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সে অনৈক্যজনিত দিকেও সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

এরপর মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী আদর্শ সমাজ বিনির্মানের উপায়-উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সমস্যার দন্তনখরাঘাতে আমাদের সমাজদেহ আজ নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত। সমাজের মানুষের জীবনে একটু স্বস্তি, একটু শান্তি ও অস্থিরতামুক্ত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা-তদবিরের কমতি নেই। "অভাব যেখানে, কলহ সেখানে"- এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে অভাব দূরীকরণ ও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে কার্যসূচিও গৃহীত কম হচ্ছে না। কিন্তু হলে কি হবে, প্রত্যেকে নাগরিক দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম ও দেশগড়ায় প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে না আসলে রাষ্ট্রীয় আইন কতক্ষণ মানুষের পাহারাদারী করতে পারে? এ দায়িত্ববোধের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সরিষাকে ভূতে পেয়ে সকল প্রচেষ্টাই আবার নতুন সমস্যার কবলে পড়ে। খোদ দেশের সংসদ

সদস্যদের বিরুদ্ধেও মারাত্মক অভিযোগ। সর্বত্রই বাকচাতুর্য এবং কথা ও কাজের কাকতালীয় অবস্থা। নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন কোথাও বোধ করা হচ্ছে না। নিয়মের সীমা উপেক্ষা করে সহজ পথে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হবার প্রবণতাই সর্বত্র সক্রিয়। আইনের সীমায় যেন কেউ আবদ্ধ থাকতে চায় না। এ সীমা মেনে চলে ব্যক্তি স্বার্থকে দ্রুত স্ফীত করা যায় না, তাই আইন হয়ে পড়েছে সর্বত্র গৌণ।

কোন দেশ ও সমাজের সর্বনাশের জন্যে মুষ্টিমেয় কিছু লোকই দায়ী নয়। এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে অন্যরাও দায়ী থাকে। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাটাও অন্যায়ের সাথে শরিক থাকারই নামান্তর।

সমাজের অশান্তি দূরীকরণ ও ভারসাম্য রক্ষাকল্পে সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সূচনা হিসাবে পারিবারিক শান্তি ও পরিশুদ্ধি অপরিহার্য। কারণ, পারিবারিক পরিমণ্ডলে নীতি-জ্ঞানই মানুষের বড় মূলধন। পারিবারিক পরিমণ্ডল সুস্থ রাখার জন্যে ইসলাম যে সকল নিয়মবিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে, কল্যাণকারিতার দিক থেকে এগুলো তুলনাহীন।

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। একে অপরকে প্রতারিত করবে না, মিথ্যা আচরণ করবে না, দুর্দিনে অপর ভাইকে ত্যাগ করবে না। একের পক্ষে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করা হারাম। সাদার উপর কালোর এবং কালোর উপর সাদার, তেমনি আরবের

উপর অনারবের এবং অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে আল্লাহভীতির মানদণ্ডে। সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরি।[৩০]

বস্তুত এ মহান শিক্ষা অনুভূতিই মুসলমানদেরকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখে আর এটি সামাজিক এমন এক সাম্যবোধের সৃষ্টি করে যার কোন বিকল্প নেই। ইসলামী সমাজ-কাঠামোর ভিত্তি রচনায় আবহমানকাল ধরে যে সকল উপকরণ কাজ করে আসছে, আমাদের সামাজিক সমস্যাবলী এবং আজকের সামাজিক অস্থিরতা দূর করতে হলে সে সকল উপকরণ পুণরায় সংগ্রহ করতে হবে।

এরপর মাওলানা কিসমতী জ্ঞান - বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্বারোপ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সাথে সাথে মানুষ দিনের পর দিন বিষয় ও বস্তু রহস্যের গভীরে গিয়ে উপনীত হচ্ছে। অতীতের অনেক মনগড়া ধারণা যেমন এ বাস্তবতার সামনে টিকে থাকতে

[৩০] বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) এই ঐতিহাসিক উপদেশ দেন।

পারছে না, তেমনি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত অনেক খোদায়ী গ্রন্থের বাণীর বাস্তবতা আজকের বিজ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা মানব জাতির সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। অথচ এক সময় আল্লাহর বাণীকেও এক শ্রেণীর জড়বাদী বৈজ্ঞানিক ঐ মনগড়া কথারই আওতায় ফেলে তাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটা তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ৪০ জন সেরা বিজ্ঞানী যখন এ মর্মে রায় দিয়ে দিলেন যে, বিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নাস্তিকতা অবলম্বনের কোন অবকাশ তো নেই-ই বরং বিজ্ঞানের দ্বারাই সর্বত্র এক মহা স্রষ্টার অস্তিত্বের নিদর্শনাবলী ধরা পড়ছে। খোদায়ী গ্রন্থে বর্ণিত যে সকল কথা এক সময় মানুষ নিছক আস্তিক বিশ্বাসের বশবর্তী হবার দরুন বিনা যুক্তি-প্রমাণেই সত্য বলে মেনে নিত সেগুলোর স্বপক্ষে আজ বৈজ্ঞানিক চাক্ষুষ প্রমাণাদি উপস্থাপিত হচ্ছে। যেমন ভূমন্ডল, নভোমন্ডল ও এগুলোর সকল কিছু সম্পর্কে বলা হতো যে, এগুলো নূরের তৈরি।

সে সময় একথাটি অবিশ্বাসী তো বটেই অনেক বিশ্বাসীর কাছেই দুর্বোধ্য মনে হতো। কিন্তু আজকের উৎকর্ষিত বিজ্ঞান গবেষণার ফল হলো সব কিছুতেই অণু-পরমাণু বিদ্যমান। বলা হতো, রক্ত-মাংসের শরীরের পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করা কঠিন বিধায় শেষ নবী কর্তৃক মাটির পৃথিবী থেকে গিয়ে মহাকাশ সফর করে আল্লাহরসান্নিধ্য লাভ ও তাঁর সাথে কথোপকথন সম্ভব নয়, কিন্তু আজকের মানুষদের বর্তমানে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মহাকাশে উড়ে বেড়ানো সে ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। আজকের দিনে আলোর গতি-রহস্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী স্বল্প সময়ের মধ্যে মহানবী (সা.) কতৃক মহাকাশ সফর শেষে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসা এবং যাবার সময়কালীন ঘরের নড়ন্ত কপাট তখনও নড়া থেকে পুরাতন অসম্ভব ধারণাকে এখন সম্ভাবনায় আওতায় নিয়ে এসেছে। মানুষের কথিত যেকোন কথাই সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, এ মর্মে কুরআনের যে উক্তি সম্পর্কে এক সময় শুধু বিশ্বাসীদের আল্লাহরকুদরত বলা ছাড়া কোন জবাব ছিল না, আজকাল মানব জ্ঞান উদ্ভাবিত সামান্য ফিতার মধ্যে মানুষের বক্তব্যসহ যেকোন শব্দ ধরে রাখা হচ্ছে।

ফলে সে প্রশ্ন এখন আর উঠছে না। এমনকি শোনা যায়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ অতীতে যত কথা বলেছে, সেগুলোও ধরার এবং চিহ্নিত করে শোনার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। মহানবীর হাদীসে বর্ণিত উক্তি অনুসারে প্রত্যেক মানুষের যখন এ জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটার পর 'বরযখী জগতে' তার নতুন জীবনের সূচনা ঘটে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, "তোমার প্রভু কে? তুমি কোন

দ্বীনের অনুসারী ছিলে?" তখন এই সাথে শেষ নবী (সা.) কেও তার সামনে উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করা হবে যে, ইনি কে? তখন পূণ্যবান ব্যক্তিরা সবক'টি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে সক্ষম হবেন; কিন্তু অন্যেরা "হায়! আমি তো জানি না " বলে উত্তর দেবে। এ যাবত অনেকের প্রশ্ন ছিল, একই সময় অনেক মৃত ব্যক্তিরই হয়তো "আলম-এ-বরযখে" এ সওয়াল জবাব চলতে থাকে, শেষ নবী একজন বিধায় এত অধিক স্থানে তাঁকে দেখানো কি করে সম্ভব। কিন্তু আজকের দিনে বিজ্ঞানের বিরাট আবিষ্কার- টেলিভিশন সে জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছে। একই সময় এক মুহাম্মদ আলী ক্লে-কে বিশ্বের লাখো কোটি লোক টিভিতে মুষ্টিযুদ্ধরত অবস্থায় দেখে কিংবা সুদূর মেক্সিকো শহরের মাঠে বল খেলা চলছে। বিশ্বের কোটি কোটি টিভির পর্দায় একই গোলদাতাকে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ গতিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের গোলকিপারের সদাসতর্ক শ্যেণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে বলটিকে পদাঘাত করে গোল দিয়ে দর্শকদের করতালি পাচ্ছে। এমনিভাবে এক সময় দু'বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস ও গেলিলিওর মধ্যে মস্তবড় মত পার্থক্য ছিল যে, পৃথিবী ঘুরে না সূর্য ঘুরে। কেউ বলেছেন, পৃথিবী এক জায়গায় স্থির থাকে সূর্য ঘুরে, কেউ বলেছেন সূর্য এক জায়গায় স্থির থাকে পৃথিবী ঘুরে। অথচ কুরআন বলে আসছে, প্রত্যেক গ্রহ তার নিজ নিজ কক্ষে সন্তরণ করে, একটির সাথে অপরটির মিলিত হবার সুযোগ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ মত হলো পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের তথ্য সঠিক নয় বরং সূর্য, পৃথিবী ও সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই ঘুরে। বলাবাহুল্য, এই সবশেষ বক্তব্যই কুরআনের উক্তিকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করছে।

দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা লাভ প্রসঙ্গে লেখক বলেন, ধর্মীয় রীতি নিয়মসমূহ মেনে চলাকে সাধারণত মানবিক ও নৈতিক সুস্থতার মাধ্যম এবং শুধু পরকালীন মুক্তির উপায় বলেই মনে করা হয়। এর মধ্যে যে মানব স্বাস্থ্যের সুস্থতা নিহিত, একথার তেমন একটা চর্চা হয় না। ঝাড়ফুঁকের অলৌকিক গুণের কথা নয়- খোদ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও যে ধর্মীয় নিয়মরীতি পালনে রোগ নিরাময় হয় বা কোন কোন রোগের উৎপত্তিই হয় না, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাই এখন তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে দুনিয়াবাসীর সামনে যেমন মাহে রমযানের কৃচ্ছতা সাধনার ফলে মানব দেহের কি কি কল্যাণ সাধিত হয়, তা সপ্রমাণ আকারে উপস্থাপিত হচ্ছে, তেমনি দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানরা যে সকল ধর্মীয় নিয়মবিধি পালন করে, যেমন মলমূত্র ত্যাগের পর ইসলামী কায়দায় পবিত্রতা অর্জন, ওযূ, গোসল, নামায, মসজিদে গিয়ে জামায়াতে অংশগ্রহণ, যিকির-ফিকির ও ধর্মীয় শিক্ষানুশীলন, হালাল

রুজি ভক্ষণ, পরোপকার, চরিত্রহীনতা, অশ্লীলতা ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকা, পরনিন্দা ও অসদ্ভাব বর্ধক কাজ এড়িয়ে চলা, কুরআন-হাদীস পাঠ করা ইত্যাদি ধর্ম-কর্মের ফলেও মানব স্বাস্থ্যের অনেক উপকার সাধিত হয়। এর ফলে হ্রাস পায় অনেক রোগ ব্যাধি।

ঢাকা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে ডাক্তার নূরুল ইসলাম বলেন:

"ধর্মীয় নিয়মবিদি মেনে চললে রোগ অনেক কমে যায় এবং স্বাস্থ্য সুন্দর থাকে। সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক সুস্থতা। সবাই নৈতিক, সামাজিক দিক থেকে সজাগ হলে জাতীয় সুস্বাস্থ্য সম্ভব। নিম্ন বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোথাও নৈতিক স্বাস্থ্য নেই, তাই শারীরিক স্বাস্থ্যও নেই। ধর্মীয় বিধি-বিধান না মেনে অশ্লীলাত ও অনৈতিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে 'এইডস'- এর মতো দুরারোগ্য ব্যাধি জন্ম নেয় ...। ডাক্তার নূরুল ইসলাম বলেন যে, ভয়াবহ 'এইডস' রোগের অন্যতম কারণ অশ্লীলতা তথা সমকামিতা। এর ভয়ে যদি আমরা আস্তেআস্তে নৈতিকতার দিকে ঝুঁকতে পারি।" তিনি বলেন, যেসব দেশে 'এইডস' রোগ হয় সেসব দেশ নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতনে গেছে। উল্লেখ্য যে, পশ্চিমা চিকিৎসকদের মতে, সমকামিতাসহ এ ধরণের যৌন অনাচারসমূহ 'এইডস' রোগের উৎস- যা মানব দেহের অন্য সকল রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধক শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়।[৩১]

ধর্ম মানুষের মধ্যে পবিত্র ভাব ও চেতনার সৃষ্টি করে এবং অসৎ প্রবণতাকে দূর করে। জগতের যত সব ক্রিয়া-কর্ম চাই ব্যক্তি মানুষের হোক কিংবা সমষ্টির, এ সবই মানুষের মননশীলতার বহিঃপ্রকাশ। অনৈতিক, চরিত্রহীনতা, অশীলতা, বিকৃত ও কলুষিত চিত্তেরই ফলশুতি, যা মানুষকে এমন সব বদ-ভ্যাসের দিকে টেনে নেয়, যে সকল অভ্যাস মানব স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ। যেমন- এখানে মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার কিংবা ধূমপানের কথা উলে-খ করা যেতে পারে। মহান স্রষ্টা মাদক জাতীয় দ্রব্যসমূহের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন। যে সকল সমাজে এ নিষেধ অমান্য করে মানুষ বল্গাহীনভাবে মাদক দ্রব্য ব্যবহারে লিপ্ত হয়, এর সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত মারাত্মক ক্ষতি লক্ষ্য করে আজকাল সে সকল সমাজ আইন করে তা নিষিদ্ধ করছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেই ধূমপানকে খারাপ মনে করা হয়,

[৩১] চিন্তাধারা, পৃ. ৬১-৬২

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে এটিতে যক্ষ্মা, ক্যান্সার ও অন্যান্য দুষ্ট-ব্যাধির অস্তিত্বের কথা বলা হচ্ছে এবং এ থেকে দূরে থাকার জন্য বিশ্বব্যাপী উচ্চারিত হচ্ছে সতর্কতার বাণী ।

সকল মানুষের জন্য নিয়মিতভাবে শরীরচর্চা বা কায়িক পরিশ্রম করা সম্ভব নয়, যা শারীরিক সুস্থতার জন্যে একান্ত জরুরী । কর্ম-ব্যস্ততা থেকে উঠে এসে দিবা-রাত্রি পাঁচ বেলা মসজিদে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে শরীর চর্চার স্বাভাবিক এক ব্যবস্থা বললে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না । চিকিৎসা শাস্ত্র মতেই সূর্যোদয়ের পূর্বে গাত্রোত্থান ও ভোরে শীতল হাওয়ায় চলাচল ও তা সেবন স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর । ফজরের নামায মসজিদে জামায়াতে আদায়ের মধ্য দিয়ে অনায়াসেই সে সুযোগ লাভ করা যায় । এমনিভাবে মিসওয়াক করা, মলমূত্র ত্যাগের পর ইসলামী পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন, পানাহারের পূর্বে ওযূ বা হাত মুখ ধৌত করা ইত্যাদি ইসলামী কাজ মানব স্বাস্থ্য রক্ষায় বিরাট সহায়ক । কারণ, এতে বীজাণু নষ্ট হয় ।

সৎ চিন্তা ও সদানুশীলনের সাথে রয়েছে মানবদেহের নিবিড় সম্পর্ক । যেমন একজন হাস্যরত সুস্থ-সবল মানুষকে তার কোন প্রিয়জনের দুঃসংবাদ শুনাবার সাথে সাথেই সে ভেঙ্গে পড়ে, মুর্ছা যায়,এমনকি মারাও যায় । তেমনি মানবদেহে ধর্মচিন্তা ও ধর্মকর্মেরও একটা সুপ্রভাব থাকা অতি স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞান সম্মতও । এ জন্যে চিকিৎসকরা অনেক রোগীকে সৎ চিন্তা করতে বলেন এবং অসৎ চিন্তা পরিহার করে চলতে নির্দেশ দেন । কেননা, এটা তার শরীরের জন্য ক্ষতিকর ।

জীবনের লক্ষ্য- আদর্শের সাথে সাহিত্যের নিবিড় সর্ম্পক থাকে । এর অনুসারীদের জীবন সে অনুসারেই গড়ে ওঠে, ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে । তেমনিভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের লক্ষ্য হলো ইহ-পরজীবদের মহা পরাক্রমশালী সত্তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন । মানুষ এ ভূপৃষ্ঠে তাঁরই প্রতিনিধি । বলাবাহুল্য, প্রতিনিধির একমাত্র কাজ হচ্ছে নিজ প্রভু ও মনিবের নির্দেশাবলীর অনুসরণ করা । তাকে সন্তুষ্টি রাখা । এ কারণেই মুসলমানদের প্রতিটি কাজ, তার জীবন-মৃত্যু, ইবাদত, মিত্রতা, বৈরিতা, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, তার লেখা, বক্তৃতা সকল কিছুই আল্লাহর জন্যে ।

একটি দেশের সংস্কৃতি সেদেশের মানুষের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং সামাজিক অবস্থার উপর বিস্তার করে । এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন, কোন জাতির রণাঙ্গনের পরাজয় আসল পরাজয় নয়-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরাজয়ই তার সার্বিক পরাজয় । কারুর রণাঙ্গনের পরাজয় যেমন তার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই সূচিত হতে থাকে, তেমনি রণাঙ্গনের পরাজয়কে জয়ে রুপান্তর করতে হলেও

আগে সাংস্কৃতিক রণাঙ্গনে তাকে জয়ী হতে হয়। বস্তুত এ কারণেই বিশ্বের সকল জাতিই নিজ নিজ সংস্কৃতি রক্ষায় সদা সচেষ্ট। একই কারনে আমরা নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার এবং অপসংস্কৃতি রোধের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। আমাদের দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ প্রায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

ইসলাম একটি জীবনদর্শন। এ জীবনর্দশন মানুষের বৃত্তিসমূহ পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামের মূল্যবোধগুলো সক্রিয় থাকবে। তথা ইসলামী সমাজে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য, ভাষ্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলা ইসলামী মূল্যবোধের বাহন হবে- একথাই আমাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে হবে। অন্যথায় এতে কোনরুপ অস্পষ্টতা আমাদেরকে লক্ষ্যে অপক্ষ্যে সেই সংস্কৃতির যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ করা অসম্ভব কিছু নয়, যার আশংকা আমরা ব্যক্ত করে থাকি। পরিশেষে কথা একটিই, ইসলামী জীবন-চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতির নাম যাই হোক, সেটা এদেশে ও সমাজের জন্যে যেমন সংস্কৃতি পদবাচ্যের অধিকারী হতে পারে না, তেমনি সেটা এখানে গ্রহনযোগ্য নয় ।এরুপ সংস্কৃতিকে কেউ এখানে ছলে- বলে- কৌশলে গ্রহনযোগ্য করার চেষ্টা করলে, সেটা বিদেশী হস্থক্ষেপের পথকে সূগম করারই নামান্তর হবে

দেশে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার এবং অপসংস্কৃতি উৎখাত ও নির্মূলের আহবান স্বাধীনতার পর থেকে দেশ ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তি এবং সুধীজনদের কাছ থেকে জাতি কতবার যে গুনেছে তার ইয়ত্তা নেই। এসব আহবানের ওপর ভিত্তি করে এবং স্বতন্ত্রভাবেও প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আগামীতেও এভাবে লেখালেখি হবে এবং আহবানও জানানো হবে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, এ সম্পর্কে লেখালেখি করা এবং দায়িত্বশীলদের আহবান জানানো সমান্তরাল ধারায় চলতেই থাকবে, দু'য়ের মধ্যে সমন্বয়ের সংযোজন যেন কোন দিন হবে না। যারা লিখেছেন এবং যাঁরা আহবান জানিয়ে আসছেন, উভয়ের আন্তরিকতায় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আহবানকারী কর্তাব্যক্তিদের অপসংস্কৃতি বন্ধ করার যে শক্তি আছে, তা অন্যদের নেই। আর প্রতিরোদের আইনগত শক্তির প্রয়োগ যেহেতু নেই, তাই অপসংস্কৃতির শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং

দৌরাত্ম্য বাড়ছে। আশংকা হয়, একদিন লেখালেখিও বন্ধ হয়ে যাবে আর অপসংস্কৃতি এদেশের মূল সংস্কৃতি হিসেবে স্থায়িত লাভ করবে।

অতঃপর মাওলানা কিসমতী মহিলা মাদরাসা ইসলামী সমাজের একটি অবকাঠমো বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এদেশ একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হোক, এখানে নবী মোস্তফা (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হোক, এ আকাঙ্ক্ষার কোন কমতি নেই। আরশে আযীমের মালিক, বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ ওহী বাহক জিব্রাঈলের মাধ্যমে কুরআনের আকারে যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রদান করেছেন, এর অবকাঠামো তৈরির নীতিমালা মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠিয়েছেন। তা সমাজে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশে শান্তি-শৃংখলা ও সুখ-সমৃদ্ধির ফলগুধারা বয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রেরণা থেকেই এখানে নানাভাবে ইসলামের অনুসারীদের কাছে চলছে, বাংলাদেশে বর্তমানে কি পাকিস্তান আমলে ইসলামের চর্চা নানাভাবে এত অধিক হয়েছে এবং হচ্ছে যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারপরও এখানে কেন ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না? এ জিজ্ঞাসা আজ অনেকের মনকেই নতুন করে নাড়া দিচ্ছে। এমনকি অনেকের মনে এ আশংকাও দেখা দিয়েছে যে, এদেশে বহু চেষ্টা-সাধনার ফলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে জাগরণ দেখা দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত জনগনের মধ্যে তা টিকে থাকবে কিনা। কারণ, তার পাশাপাশি একে নস্যাৎ করার জন্যে গৃহীত বিভিন্ন পন্থাও এমন পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে যে, ইসলামপন্থী সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেও তা রোধ করা যাবে কিনা সন্দেহ।

এরপর তিনি ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রতিষ্ঠার দাবির পূর্বে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সর্বপ্রথম সকলের সামনে স্পষ্ট থাকা দরকার। আসলে ইসলামের লক্ষ্য এবং ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ইসলামের লক্ষ্য যেমন মানুষের ব্যাক্তি ও সমষ্টি জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর বিধানের প্রাধ্যন্য প্রতিষ্ঠা করা, তেমনি ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর বিধিবিধানসমূহ অবগত হবার সাথে সাথে সেগুলো যথাস্থানে কার্যকরী করার দুর্জয় মনোভাব গ্রহন করাপ।

ইসলামী শিক্ষার এ লক্ষ্য থেকে যে কোন প্রকার বিচ্যুতি ঘটলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যতভাবেই ঢালাই করে সাজানো হোক, তার দ্বারা অন্য কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জিত হলে হতে পারে কিন্তু ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

ইসলামী শিক্ষার উপরোল্লিখিত দাবি পূরণ করার সাথে সাথে তাতে বৈষয়িক তথা আধুনিক শিক্ষার প্রশ্ন আসে। আসলে গভীরভাবে চিন্তা করলে ইসলামে দ্বীন-দুনিয়ার পার্থক্য করা হলে এর দ্বারা যেমন ইসলামের পরিপূর্ণবিধান হওয়া সংক্রান্ত পরিচয় খর্ব হয়, তেমনি মুসলমানদের জন্যে দুনিয়াবী তথা বৈষয়িক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার বিভক্তিকরণেও প্রশ্ন দেখা দেয়। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, কোন ব্যক্তির নিয়তে গড়বড় থাকলে তার প্রত্যক্ষ কুরআন পড়াও ক্ষেত্র বিশেষে দুনিয়াদারী হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান সম্বলিত গ্রন্থের শিক্ষা- আর্দশ মাফিক ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনকল্পে একজন মুসলমানের জীবন ধারণের অমোঘ তাগিদে কৃষি বিদ্যা এবং বাসস্থান ও যোগাযোগের প্রয়োজন পূরণার্থে দ্রুতযান ও স্থাপত্য শিল্পের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তে আনাও ধর্মীয় কাজের শামিল হয়ে যায়। অনুরুপভাবে কোন মুসলমানের শারীরিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে ডাক্তারী তথা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান জানা তার জন্যে জরুরী। তদ্রুপ মুসলমানের জীবন যাত্রার অমোঘ প্রয়োজনেই প্রযুক্তি বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা আয়ত্তে আনা দরকার। এসব শিক্ষায় মুসলিম জীবনের প্রয়োজন ও মূল লক্ষ্যের সহায়তার উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকলে সেগুলোও ইসলামী শিক্ষার বাইরে গণ্য হবে না।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কেন প্রয়োজন এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা বিশ্বজনীন স্বীকৃত সত্য যে, মাতৃভাষাই হচ্ছে মনোভাব ব্যক্ত করার এবং কোন বিষয়-রহস্য পূর্ণাঙ্গরুপে অনুধাবনের প্রধান বাহন। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে সূরা ইবরাহীমে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে, "আমি প্রত্যেক পয়গম্বরকে তাঁর জাতির ভাষার মাধ্যমেই প্রেরণ করেছি, যেন তিনি তাদের সামনে স্পষ্টভাবে (রিসালাতের পয়গাম) ব্যক্ত করতে পারেন।" কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যম এই সেদিন পর্যন্তও মাতৃভাষা ছিল না। অবশ্য এখন আলীয়া নেসাব মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয়, যদিও কওমীগুলোতে এখনও তা অনুসৃত হয়নি। মাদ্‌রাসার প্রাথমিক স্তরেও অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। ফলে মাদ্‌রাসা পাসদের মধ্যে মাতৃভাষায় ইসলামী শিক্ষা-আদর্ম প্রচার কিংবা ইসলাম বিরোধী কোন চ্যালেঞ্জের জবাব দান সম্ভব হয়ে ওঠে না। এজন্যে মাদ্‌রাসার মিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা অবশ্যই হতে হবে এবং মাতৃভাষা শিক্ষার উপর অধিক জোর দিতে

হবে। তবে এখানে যে সব পাঠ্য থাকবে বিশেষ করে নিম্ন বা উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসসমূহে, সে সব বই ইসলামী ভাবধারা পুষ্ট সাহিত্য হওয়া জরুরী।

শিক্ষাদানের যোগ্যতা ও শিক্ষক ট্রেনিং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়োজন করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরীক্ষা পাস করার মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী তাদের যেসব সার্টিফিকেট লাভ করে, কোন শিক্ষক বা শিক্ষিতের জ্ঞানের পরিমাপের জন্যে সেসব সনদ বা সার্টিফিকেটই যথেষ্ট নয়। অতীতে থাকলেও আজকাল তো নয়ই তাই সার্টিফিকেট দেখেই কাউকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এমন বহু সার্টিফিকেট ধারী রয়েছে যাদের উচ্চ ডিগ্রী থাকলেও শিক্ষাগত জ্ঞানের উচ্চতা তত নয়। ফলে এরুপ লোক শিক্ষকের আসনে বসে শিক্ষার্থীদের জীবনই বরবাদ করে। তদরুপ কোন ব্যক্তি হয়তো নিজে যথেষ্ট মেধাবী-যে কোন বিষয় ভালো বুঝে। কিন্তু নিজে বুঝা আর অপরকে বুঝানো এক কথা নয়। শিক্ষা-দীক্ষায় গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী হলেও শিক্ষাদানেও যে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন এবং তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে, এমনটি নাও হতে পারে। এজন্যে শিক্ষক নিয়োগকালে শিক্ষকের শিক্ষাদানে যোগ্যতা যাচাই করা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একই লক্ষ্যে শিক্ষকদের ট্রেনিং অপরিহার্য।

শিক্ষাদান ক্ষেত্রে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণের সাথে সাথে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। একজন শিক্ষক শত যোগ্য ও সুপন্ডিত হলেও তার নৈতিক, চারিত্রিক ও চিন্তাধারাগত ত্রুটি শিক্ষার্থীদের জীবনে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে এবং শিক্ষার্জনের মূল লক্ষ্যকেই মাটি করে দেয়। শিক্ষক যদি নিজেই পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রদের নকল পরিবেশন করেন বা নকল করার সুযোগ দেন, তাহলে ছাত্ররাও মিথ্যাবাদী হবে। শিক্ষক আমল-আখলাকে গাফিল বা অসাধু হলে, তার প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়বেই। শিক্ষক আল্লাহ্‌ভীরু, সাধু, জ্ঞানানুসন্ধিৎসু এবং আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হলে তাঁর ছাত্ররাও লক্ষ্যে অলক্ষ্যে তাঁরই অনুসারী হয়ে উঠবে। যে কোন শিক্ষা, বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের শিক্ষাদানের যোগ্যতার সাথে সাথে তাঁর নৈতিক, চারিত্রিক ও চিন্ত াধারাগত গুণাগুণও পূর্বশর্ত হওয়া উচিত। এ সকল বাছ-বিচারের অভাবে আমাদের শিক্ষাঙ্গন আজ কলুষিত। আমাদের সন্তানরা আজ শিক্ষার সাহায্যে নিজেদের মানবীয় সৎগুণাবলীর বিকাশ সাধনের পরিবর্তে অমানবিক রীতিনীতি, চরিত্রহীদনতা, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, খোদা বিমুখতা ও বিভিন্ন দুর্নীতির ধারক হয়েই গড়ে উঠছে। মাদরাসাগুলোতেও সেই ঢেউ এসে ধাক্কা দিচ্ছে। ইসলামী শিক্ষার

মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রধান চাবিকাঠির ভূমিকাই হলো শিক্ষকের। তাদের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি এ শিক্ষাকে কিছুতেই তার মূল লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে দিবে না। তাই ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকদের সকল সময়ই নিজের ব্যক্তিত্ব, গুরুত্ব ও 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' হবার কথা স্মরণে রেখে চলতে হবে।

যেই কিতাব পড়াতে মাত্র তিন মাস সময়ের প্রয়োজন, যে বিষয়ের উপর মাত্র দু'টি বই পড়ানোই যথেষ্ট- সেক্ষেত্রে দীর্ঘ বারটি মাস ব্যয় করা এবং একই বিষয়ের উপর অহেতুক ৩/৪ টি কিতাব পড়ানোর মাধ্যমে সময়েরই অপচয় হয়। তেমনি কিতাবের কোন একটি বিষয় বুঝাতে যেখানে ২/৩ মিনিট সময়ের দরকার, সেক্ষেত্রে ২/৩ দিন লাগিয়ে সময়ের অপচয় ঘটানো শিক্ষাদানে অনভিজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। তাতে ছাত্রদের অমূল্য জীবনের বিরাট অংশ নষ্ট হয়। এ জন্যে শিক্ষক ট্রেনিংয়ের প্রয়োজনটি যে কত বেশি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিক্ষকগণ ছাত্রদের যা শিক্ষাদান করেন, সেটা ছাত্ররা কি পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করলো, না আদৌও সবক ধরতে পারেনি, আজকাল তা জানার কোন দরকার মনে করা হয় না। অথচ সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বে যত চিন্তাশীল, মনীষী গুজরে গেছেন, তাদের ছাত্রজীবনের পাঠচক্র সম্পর্কে এটাই জানা যায় যে, শিক্ষাগুরু ছাত্রদের যা পড়াতেন তার উপস্থিতিতেই ছাত্ররা সেটা নিয়ে চর্চা করতো। পাশ্চাত্যের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয় শিক্ষাদানের সময় এখনও এ রীতি বিদ্যমান। অপেক্ষাকৃত ভালো ছাত্ররা বার বার অন্যদেরকে সবক ধরিয়ে দিত। কোথাও কোন ভুল করা হলে শিক্ষকরা তখনই তা সংশোধন করে দিতেন। এর ফলে শিক্ষকের শিক্ষাদানের সময় কারও কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলেও পরবর্তীতে পারস্পরিক আলোচনায় সেটা বুঝে এসে যেত। তাতে এজন ছাত্রের মধ্যে ছাত্রজীবনেই শিক্ষকতা করা ও বক্তৃতাদানের যোগ্যতাও সৃষ্টি হতো।

জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠাগার সম্প্রসারণ ও পাঠকের চাহিদানুযায়ী বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী সংগ্রহ করার ব্যাপারে তিনি জোড়ালো দৃষ্টিপাত দেন, জ্ঞানই শক্তি। যে জ্ঞানরাজ্যের রাজা বস্তুগত শক্তিতেও সে শক্তিমান। আত্মশক্তিই দৈহিক শক্তির উৎস। আত্মার মৃত্যু বড় মৃত্যু। আত্মবিকাশের মধ্য দিয়েই মানব সত্তার বিকাশ ঘটে। আত্মাবিহীন দেহ পঁচা লাশ মাত্র। জ্ঞান প্রসারের দ্বারাই আত্মা উৎকর্ষ লাভ করে। তাই যুগে যুগে জ্ঞান পরিধি বাড়ার জন্যে পৃথিবীর উন্নত ও সভ্য জাতিগুলো নানাভাবে চেষ্টা করছে। আজ যারা বিশ্বদরবারে নতুনভাবে মাতা উঁচু করে দাঁড়াতে যাচ্ছে, তাদের উন্নতি ও জয়যাত্রার পেছনেও এই জ্ঞান প্রবৃদ্ধিই সহায়তা যোগাচ্ছে।

সরকার দেশে বর্তমানে যে বিভিন্নমুখী উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, সেগুলো কি কি এবং কোন ধরণের কাজ ও তা কোথায় হচ্ছে, এসব বিষয় জনগণের জানা একান্ত প্রয়োজন। রেডিও, টিভি কয়জনেরই বা থাকে। আবার থাকলেও গ্রামের কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে যথাসময় রেডিও'র গোড়ায় বসে থাকাও সম্ভব নয়। পাঠাগার থাকলে রাতে বা অবসর মতো স্বল্প শিক্ষিত লোকেরাও এসে সেখানে খবরের কাগজ ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা জানতে পারবে। এতে আরেকটি কল্যাণ এও সাধিত হবে যে, কোন বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক শ্লোগান সহজে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কেননা, পত্র-পত্রিকার সাহায্যে মানুষ সহজেই ঐ সকল শ্লোগানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হবে।

অতএব দেশের মানুষের পেটের খোরাকের সংস্থানের ব্যাপারে যে তৎপরতার পরিচয় দেয়া হচ্ছে, তেমনি দেশবাসীর মনের খোরাক পরিবেশনের উদ্দেশ্যেও সরকারী বেসরকারীভাবে গ্রাম বাংলর সর্বত্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ জন্যে রীতিমতো একটি অভিযান পরিচালিত হওয়া উচিত। অন্যথায় জাতিকে উন্নতি অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো কষ্টকরই হবে।

আলিম ও পীর মাশায়েখরা যেন একত্রে কাজ করতে পারে সেজন্য তিনি ওলামা একাডেমি করার ব্যাপারে গুরত্বারোপ করে বলেন, ঔপনিবেশিক শাসন ও শিক্ষানীতির ফলে আমাদের দেশের মুসলমানদের মাঝে যেমন গত দীর্ঘকাল ধরে দু'ধারার শিক্ষা চালু হয়ে আসছে, তেমনি শিক্ষিতদের মাঝেও দু'ধারার শিক্ষিত লোক তৈরি হচ্ছে। এক শ্রেণী বস্তুগত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর ধর্মীয় প্রয়োজনে যখন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোর সাথে পরিচিত হতে চায়, তখন ভাষাগত অসুবিধা তাদের সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। অনুবাদ ইত্যাদির সাহায্যে কিছুটা আলোকপ্রাপ্ত হলেও মূল ভাষা থেকে মর্ম উদ্ধারের ব্যর্থতা ইসলামী জ্ঞানার্জনের স্পৃহায় তাদেরকে অতৃপ্ত রাখে। শুধু তাই নয়, যারা অত্যন্ত দরদ সহকারে ইসলামী মৌল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন কোন যুগ-সমস্যার সমাধানের চিন্তা করেন এবং বিজাতীয় ভাবাদর্শের অনুসরণ থেকে জাতিকে রক্ষা করতে চান, তারাও ভাষাগত এই অসুবিধার দরুনঅস্বস্তি বোধ করেন। অপরপক্ষে যেই শ্রেণীটি শুধু আরবী লাইনে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়, তারা ব্যক্তিগতভাবে আরবী ভাষায় লিখিত ইসলামের মুল বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকা সত্ত্বেও বাংলা-ইংরেজী ভাষা না জানায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বৃহত্তর অঙ্গনে ইসলামের শিক্ষা আদর্শকে আধুনিক মন-মানসিকতার সামনে আকর্ষনীয়ভাবে তুলে ধরতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় বৈকি।

সরকারী-বেসরকারী যেই উদ্যোগেই হোক, এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। দেশের উপরোক্ত দ্বিবিধ শ্রেণীর শিক্ষিতদের মধ্য থেকে প্রতিভাবান, গবেষক, চিন্তাশীল ও উদ্ভাবনী জ্ঞানসম্পন্ন লোকদেরকে দেশ, জাতি ও ধর্মের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান রাখার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যে যারা দরদ নিয়ে চিন্তা করেন, তারা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলে দীর্ঘ দিনের কাঙ্ক্ষিত একটি কাজ হতে পারে।

তিনি আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমএর্ক বলেন, সংস্কৃতি একটি দেশের মানুষের জীবনধারায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যে কোন দেশ ও জাতির প্রতিচ্ছবি হলো ঐ দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। একটি জাতিকে চেনা এবং তার বর্তমান ও অতীত ঐতিহ্যকে জানার একমাত্র দর্পণ হলো ঐ দেশের শিল্প ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি। এদিক থেকে সংশি-ষ্ট জাতির শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে তাদের জীবনধারার প্রতিফলন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে যদি নিজেদের জীবন ধারার প্রতিফলন না ঘটলো, তাহলে সেটাকে কি করে ঐ জাতির শিল্প-সংস্কৃতি বলা যাবে? কি করেই বা এরূপ নাটক ঐ জাতির সংস্কৃতির বাহন হবে? তাকে তখন পরানুকরণ কিংবা পরপ্রভাবিত বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ইংরেজ শাসন-আধিপত্য থেকে এদেশ মুক্তি পাবার পরও নানা কারণে এখানকার শিল্প ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি থেকে এ কৃত্রিমতা, পরানুকরণ প্রবণতা ও পরপ্রভাব দূরিকরণ সম্ভব হয়নি।

আমাদের দেশে প্রায়ই নাট্যোৎসব হয়ে থাকে। কোন কোন সময় একমাস ব্যাপীও জাতীয় নাটোৎসব হয়েছে। কিন্তু এসব নাট্যোৎসবে বিজাতীয় চেতনারই প্রকাশ ঘটে অধিক। পরিবেশিত নাটকসমূহের মধ্যে সীমান্তের ওপারের নাটকও থাকে বা সেখানকার ধারারই পূর্ণ অনুসারী নাটক মঞ্চস্থ হয়। অথচ উভয় দেশের সাংস্কৃতিক উৎসের ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এছাড়া অভিযোগ পাওয়া যায়, কোন কোন নাটকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সত্তাকে অস্বীকার করার সুকৌশল প্রয়াস বিদ্যমান। কোনটিতে দেশী মতবাদ প্রচারের চেষ্টা চলে। কোনটিতে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় লোকদের বেশভূষার প্রতি বিদ্রুপ, কোনটির মধ্য দিয়ে সংগ্রামী ও আদর্শবান মুসলিম শাসকদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন ও তাদের সম্পর্কে দর্শক মনে সন্দেহ সৃষ্টির প্রবণতা। এছাড়া নৃত্যে আপত্তিকর, রুচিহীন ও দৃষ্টিকটু দৃশ্যের অবতারণা হয়। এতে অনেক সময় দর্শক মহলও বিক্ষুব্ধ হয়।

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রেরিত আমাদের যে কোন সাংস্কৃতিক বাহনেই এদেশের জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচিতির প্রকৃত রূপ ফুটে উঠুক এবং এ নিয়ে যে লুকোচুরি খেলা ও ষড়যন্ত্র চলছে

তার অবসান হোক, জাতির এটাই কাম্য। স্মরণ রাখা দরকার যে, সাংস্কৃতিক সীমান্ত প্রহরায় কোনরূপ শৈথিল্য অনেক সময় ভৌগোলিক সীমান্ত প্রহরার রক্ষাব্যূহকেও ভেদ করে জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে। জাতির যারা কর্ণধার তাদের এ সত্যটি তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করা উচিত।

দেশ ও সমাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও শান্তিময় করতে হলে দেশবাসীর মানসিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন ছাড়া তা সম্ভব নয়। মানসিক উৎকর্ষ না থাকলে অসৎ পবৃত্তি ও অন্যায় প্রবণতাকে রোধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই যুগে যুগে সভ্য সমাজে মানসিক বৃত্তিসমূহের উন্নতি ও উৎকর্ষে ধরাবাঁধা পদ্ধতি ও নিয়ম-রীতিসমূহের বাইরেও জ্ঞান চর্চার বিশেষ ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল ব্যবস্থাধীনে দেশের নাগরিক চরিত্র গড়ে তোলার প্রয়াস চলে। তেমনি নিজের দেশ, সমাজ, ইতিহাস, রাষ্ট্র, অর্থ, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে সমাজের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সুচিন্তিত মতামত, আলাপ-আলোচনা, তাদের জ্ঞানগর্ভ লেখা ও বক্তৃতার দ্বারা জনগণের জ্ঞানপরিধি বৃদ্ধি করা হয়। এভাবে মানুষ শিক্ষা, জ্ঞান চর্চা ও নৈতিক অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের মানবীয় গুণাবলী প্রবৃদ্ধি করার সুযোগ পায়।

এদেশের সমাজ জীবন আজ এক সংঘাতময় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিগত এই পার্থক্যের কারণে নানা প্রকার বিভ্রান্তি জাতির চলার গতিকে ব্যাহত করছে। দেশের বিভিন্ন প্রচার ও জনশিক্ষার বাহনগুলোর মধ্যে চলচ্চিত্র গণচেতনা সৃষ্টির একটি বলিষ্ঠ মাধ্যম, যার দ্বারা চিত্তবিনোদনের সাথে সাথে অনেক শিক্ষামূলক বিষয়ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে সংযোজিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্র কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের দরুন এবং কিছুটা নিছক অর্থলিপ্সা হেতু এমন ভূমিকা পালন করে আসছে, যদ্দারা সমাজ গঠনমূলক শিক্ষা লাভের চাইতে সমাজ ভাঙ্গনের উপরকরণাদিই তাতোধিক সংযোজিত রয়েছে। চলচ্চিত্রের যে কোন বইয়ের বিষয়বস্তুতেই মানুষের সস্তা আবেগকে উসকে দেয়ার কোন না কোন ব্যবস্থা থাকেই অথবা দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে প্রায় চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকার মাধ্যমে এমন অপরধমূলক বিষয়ের অবতারণা করানো হয়, যেগুলো কিশোর ও যুব চরিত্রকে সহজেই অপরাধপ্রবণ করে তোলে। অনেক চলচ্চিত্রে জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকেও সুকৌশলে যুব সমাজের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস সুস্পষ্ট। মনে হয়, যেন এ দেশ ও সমাজকে সেসব সমাজের অনুরূপ গড়ে তোলার একটি জোর প্রচেষ্টা চলেছে যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা রয়েছে।

সমাজে বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন পেশার লোক বসবাস করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ধনী আবার কেউ কেউ গরীব। মাওলানা কিসমতী তাঁর এই বই এ সমাজের গরীব ও অসহায়দের পুনর্বাসন এবং দেখার দায়িত্ব সমাজের ধনী লোকদের। আজকাল পত্র-পত্রিকায় পাঠকমনকে ভারাক্রান্তকারী খবরের সংখ্যাই বেশি, যেগুলো পাঠে আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থঅর প্রতি নিজের অলক্ষ্যেই একটি বিরূপ ধারণা উদ্রেক না হয়ে পারে না। তবে ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি খবর শত নৈরাশ্যের মাঝেও যেন আশার হালকা ইঙ্গিত দিয়ে যায়। আমাদের সমাজের অসংখ্য সমস্যা ও অভিশাপের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিও একটি। সমাজের কেউ আপন পৈতৃক সম্পদ হারিয়ে নিরুপায় হয়ে একদিন ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিলে পুণরায় তার পক্ষে স্বাবলম্বী জীবন ফিরে পাবার নজীর খুবই বিরল। কিন্তু এ ধরণেরই একটি খবর '৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় যে, গাইবান্ধা সদর উপজেলার বল-মঝাড় ইউনিয়নের বিবিজান নামের জনৈকা বিধবা মহিলা ১৮ বছর পর ভিক্ষাবৃত্তির যাতনা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। স্থানীয় জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান 'কর্মীর হাত'- এর সহযোগিতায় ৬০ বছর বয়স্কা এ মহিলা পরে স্বোপার্জিত আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক চাঞ্চল্যকর খবরের ভিড়ে এ ছোট্ট খবরটি অনেকের কাছেই তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তথাপিও এর মধ্যে সৎসহযোগিতার ফলে আর্থিক সামর্থ্য বঞ্চিত পরমুখাপেক্ষী একটি জীবনের আত্মনির্ভরশীল হবার মহান দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে।

রাজধানীর ভাসমান মানুষ একটি পুরাতন সমস্যা হলেও বর্তমানে এ সমস্যা আরও জটিল। তাদের সংখ্যা দিনের দিনই বাড়ছে। তারা এ দেশেরই ছিন্নমূল ছিন্ন বসন, মলিন চেহারার মানুষ। ফুটপাত ও কারুর বাড়ির সিঁড়ি আঙ্গিনায় তারা রাতযাপন করে। এসব মানুষ দিন গুজরান করে অনাহারে-অর্ধাহারে। মহানগরীতে এ ভাসমান মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নৈতিক ও সামাজিক অপরাধের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ সচেতন কোন ব্যক্তি ও সংস্থা তাতে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারে না। বিভিন্ন সংস্থা মাঝে মাঝে দেশের ভাসমান মানুষদের সমস্যা সমাধান ও তাদের পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে থাকেন।

আমাদের সমাজে আজকাল মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনরাই বোধ হয় এমন একটি শ্রেণী, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সমস্যাবলী ও দাবি-দাওয়া সংবাদপত্র, জনসভা, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পেলেও এ শ্রেণীটির অসুবিধা, সমস্যাবলী ও দাবি-দাওয়াসমূহ আজও অপ্রকাশিত থেকে গেছে।ইমাম-

মুয়ায্যিনদের মধ্যে যারা শহরের মসজিদসমূহের দায়িত্বে আছেন, তাদের শতকরা ৫ জনের পক্ষেও বোধ হয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে শহরে বাস করা সম্ভব হয় কিনা সন্দেহ। কেননা, মসজিদের পক্ষ থেকে সপরিবারে থাকার জন্যে তাদের উদ্দেশ্যে কোন ব্যবস্থাই করা হয় না, ফলে অধিকাংশ ইমাম-মুয়াজ্জিনকেই শহরে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাহীন অবস্থায় থাকতে হয়। অথচ নামাযের মত এত বড় ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে প্রতিটি মসজিদ কমিটির কর্মকর্তাদের উচিত ছিল তাদের পরকালের আসল সম্বল নামাযের স্বার্থে ইমাম-মুয়ায্যিনকে সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া। বেহেশতে হযরত আদম (আ.)-এর সাথী হিসাবে যে কারণে আল্লাহতা'আলা হযরত হাওয়া (আ.) কে পাঠিয়েছিলেন, যে কারণে নবী-রাসূলগণও ঈমান রক্ষার তাগিদে স্ত্রীদেরকে সাথে রাখতেন, এমনকি যে কারণে অবিবাহিত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়াকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়, একই কারণে শহরের মসজিদসমূহের ইমাম মুয়ায্যিনদেরকেও সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া মসজিদ কমিটির কর্তব্য। ইমাম-মুয়ায্যিনগণ ভদ্রতা ও শরাফতের খাতিরে কিংবা কোথাও বরখাস্তের আশঙ্কায় অন্যদের মতো বাসা বা অতিরিক্ত বেতনের দাবি না করলেও নিজেদের নৈতিক, ধর্মীয় ও ন্যায়ানুগ কর্তব্য হিসাবে মসজিদ কমিটির কর্মকর্তাদের এদিকে লক্ষ্য দান আবশ্যক, অন্যথায় এজন্যে আল্লাহরকাছে জবাবদিহির আশঙ্কা রয়েছে।

যাদের পিছনে আমরা নামায পড়ি, যাদের কাছে আমরা ধর্ম শিখি এবং আমাদের ছেলে-মেয়েরা শিখে, যাদের মনস্থিরতার উপর আমাদের নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া না হওয়া নির্ভর করে যা আমাদের পারলৌকিক মুক্তির প্রধান ইবাদত, তাদের খাওয়া-পরা এবং সপরিবারে থাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়া সকল মসজিদ কমিটির কর্মকর্তাদের একান্ত কর্তব্য।

ইসলাম যেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো পেশ করে, মুসলমানদের মাঝে ঈমানী চেতনা ও আমলী প্রেরণা অক্ষুণ্ন রেখে তার স্থায়িত্ব ও প্রসার দানে মসজিদসমূহ ও এগুলোর পরিচালক ইমামগণের তাতে বিরাট ভূমিকা থাকে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অধীন যারা এক সময় মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন, তারাই মসজিদের ইমামতেরও দায়িত্ব পালন করতেন। ইমামগণ পদবীর দিক থেকে আজও ইমাম হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁরা বহুকাল আগেই জাতীয় জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে ইমামতের ক্ষেত্রে নিজেদের যথার্থ মর্যাদা হারিয়ে শুধু মসজিদে ইমামতির মধ্যেই আপন দায়িত্বকে সীমিত করে নিয়েছেন আর এই সুযোগে তাদের ইমামতের সামাজিক অংশটুকু হাতছাড়া

হয়ে আছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে তাদের অবদান রাখার তেমন কোন সুযোগই বাকি থাকেনি। তারপরও তারা মুসলিম মিল্লাতের সুদিন-দুর্দিন উভয় অবস্থায় পাঞ্চেগানা ও জুমার নামাযের জামায়াতসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার দায়িত্ব আদায় করে আসছেন, যেগুলোর ওসিলায় এখনও মুসলিম দেশগুলোতে নামাযী মানুষের অস্তিত্ব দেখা যায়। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ইমামদের এসব সমস্যার সমাধান নিয়ে বোধহয় সমাজের উঁচু পর্যায়ে তেমন কোন চিন্তা করা হয়নি।

তবে ইসলামে ইমামত ও ইমামের যে গুরুত্ব তার প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হলে প্রথমে ইসলামের মর্যাদাকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিতে হবে। ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলেই মসজিদ, ইমাম, ইমামতসহ তার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের মর্যাদাও স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য।

মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ গঠনই মুসলিম সমাজকে যেমন বহু সমস্যার হাত থেকে নিস্তার দিতে পারে, তেমনি দেশ ও জাতি গঠনেও তা হবে বিরাট সহায়ক। অবশ্য এজন্যে ইমাম প্রশিক্ষণও আরও উন্নত মনের হতে হবে বৈকি। অন্যথায় হিতে বিপরীত হবারও আশঙ্কা নেই যে এমন নয়। এক্ষেত্রে এসেই ইমামদের মুসলিম সমাজকে যথার্থ ইমামত বা নেতৃত্বদানের পালা শুরু হবে। এ পর্যায়ে এসে ইমামদের সামান্যতম পদস্খলনও মসজিদ কেন্দ্রিক গড়ে ওঠা বর্তমান আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা-ভক্তির বেলায় স্পর্শকাতরতা দেখা দিতে পারে, যার জন্যে মসজিদে স্থূল দুনিয়াবী কথাবার্তার সাথে সাথে বর্তমানে শরীয়ত অনুমোদিত কথাবার্তাকেও আপত্তিকর দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ গঠনে ইমামগণ ইসলামের সোনালি যুগের আদর্শের উপর অটল থাকুন এবং এই মহান লক্ষ্য অর্জনে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসৃত হোক, এটাই ইসলামী ইমামতের দাবি।আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বলেন, আইনের শাসনই একটি রাষ্ট্রের শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি, অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতাকে নিশ্চিত করে। আইনের অপপ্রয়োগ কিংবা অপর যে কোন কারণে যদি আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে দেশের ভবিষ্যত এক অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আইনের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব সকলের। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যেমন, তেমনি যেই জনগণের স্বার্থে আইন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাদের দায়িত্বও এ ব্যাপারে কম নয়। তবে প্রয়োগকর্তাদের দায়িত্বটিই হচ্ছে সর্বাধিক। তাদের দ্বারা আইনের অর্মাদাজনিত একটি ছিদ্রপথের সৃষ্টি হলে, এ পথেই অসংখ্য বেআইনী তৎপরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

সমাজ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, যেসব সমস্যার ভারে কুব্জ হয়ে যাচ্ছে, এগুলোর বারো আনাই যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা বা আইনকে ফাঁকি দেয়ার পরিণতি, তা বাহ্য দৃষ্টিতে কারও বুঝে না আসলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে তাতে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ থাকে না। মানুষের অধিকারকে নিশ্চিতকরণ এবং অন্যায়ভাবে এই অধিকার হরণের যে কোন তৎপরতাকে স্তব্ধ করে দেয়াই আইনের প্রধান লক্ষ্য। ন্যায়-অন্যায়, অধিকার ছিনতাই এবং অধিকার সংরক্ষণ এই দুইয়ের পার্থক্য রেখা বজায় রাখাই আইনের কাজ।

বেআইনী তৎপরতা ও অপরাধ প্রবণতাকে প্রশয় দিয়ে সাময়িকভাবে সুবিধা পাওয়া গেলেও তা বুমেরাং হয়ে প্রশ্রয় দাতাদেরই সর্বনাশ সাধন করে। এই বাস্তব সত্যটি সমাজের সকল সচেতন মহলেই নতুনভাবে স্মরণ করা উচিত।

জাতীয় উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে মাওলানা কিসমতী লিখেছেন, বর্তমানে এটি একটি প্রশ্ন যে, "প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মহিলাদের মর্যাদা ও ভূমিকা কি হবে? এটা অনস্বীকার্য যে, জাতীয় অগ্রগতির যে কোন কর্মতৎপরতায় মহিলাদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতার বর্তমান পর্যায়ে মহিলাদের ভূমিকাকে গৌণ করে দেখার কোন অবকাশ নেই। সামগ্রিক জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে সমবেত প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

মাওলানা কিসমতী অর্থনীতিতে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে তিনি কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি শুধু একটি জাতিকে অপরের গোলামেই পরিণত করতে পারে। কোন জাতির আত্মমর্যাদাবোধই তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে। জাতীয় পরিচয়ে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তি থাকলে একটি জাতি আত্মমর্যাদাবোধ থেকে বঞ্চিত হয়। ঐ অবস্থায় লক্ষ্যে অলক্ষ্যে সে কেবল অপরের দাসত্বই করতে পারে- নিজ পায়ের উপর দাঁড়াবার কোন পথ তার কাছে ধরা পড়ে না। বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে যেখানেই কোন সমাজের মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করেছে, আত্মমর্যাদাবোধই ছিল তাদের প্রধান চালিকাশক্তি। এ শক্তিই তাকে পৃথিবীতে পরিচিত করে। এই শক্তি বলেই সে স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব অর্জন করে। সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষ যেদিন থেকে এ শক্তি হারিয়ে ফেলবে সেদিন থেকেই তাদের উপর পরাধীনতার গ্লানি এসে চেপে বসবে।

প্রতিবছর পহেলা মে সারা বিশ্বে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন হিসাবে পালিত হয়। মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক প্রতীকী দিবস হচ্ছে মে মাসের এ দিনটি। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটে ন্যায্য পারিশ্রমিকের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ থেকে সেখানে যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই আগুনই ১লা মে-কে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়েছে।

ইসলাম প্রকৃতপক্ষে, শ্রমিক ও মালিকদেরকে একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছেন এবং মালিকরা যা খায়, যা পরে শ্রমিকদেরকেও সে অনুপাতে খাওয়া-পরার ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, একসাথে বসে খাবার কথাও বলেছে। শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে যত কিছুই হোক একমাত্র ইসলাম ছাড়া মালিক-শ্রমিকের সাম্যের বাস্তব নজির কেউ স্থাপন করতে পারেনি। স্মরণ রাখা দরকার যে, শ্রমিক-রাজ কায়েমের প্রতিশ্রুতিতে যেসব দেশ গঠিত, সেখানকার পলিটব্যুরোর সদস্যদের সন্তান আর শ্রমিকদের সন্তানদের সুযোগ সুবিধা সমান নয়। ইসলাম শ্রমিকদেরকে ঘাম শুকাবার আগে আগেই তাদের পারিশ্রমিক দানের নির্দেশ দিয়ে মূলত শ্রমিকদের যথার্থ অধিকার ও মর্যাদাকে নিশ্চিত করারই নির্দেশ দিয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্য অনুসারে প্রয়োজনের চাহিদা মাফিক পারিশ্রমিক দানের রাষ্ট্রীয় নির্দেশ একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। ইসলামই উৎপাদিত সম্পর্কে শ্রমিককে লভ্যাংশ দানের বিধান দিয়েছে। এককথায়, আজকের বিশ্বে শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রে যে সংঘাত এবং শ্রমিক অসন্তোষ বিরাজমান, ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়নই এ সংঘাত ও অস্থিরতা দূর করে শান্তি-সমৃদ্ধি আনতে পারে। সুতরাং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও শান্তির লক্ষ্যে শ্রমিক-মালিক সকলের দৃষ্টিই ইসলামের দিকে নিবন্ধ হওয়া উচিত।

বইটির শেষাংশে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলাম মানবতার কল্যাণে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি সেবামূলক কাজ সম্পর্কে বলেন, এক মানুষকে অপর মানুষের প্রতি সেবাধর্মীয় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্যে

আল্লাহ্ তা'আলা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ "তোমরা সেবা ও কল্যাণ কর্মে কার আগে কে অগ্রগামী থাকবে, এজন্যে প্রতিযোগিতা করো।"[৩২]

উমাইয়া শাসনামলের খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক রাজধানী দামেস্কে অন্ধ, বধির ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্যে সরকারী খরচে সেবক রেখে দিয়েছিলেন। খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয যাকাত কারেকশনের জন্যে উত্তর আফ্রিকায় ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি যাকাত উসূলের পর তা বণ্টন করার জন্যে কোন দুস্থ গরীব নাগরিক খুঁজে পাননি। দামেস্কে একটি এমন ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান ছিল, যা গরীব গৃহভৃত্যকে সাহায্য করতো। ওখানে দুধ থেকে মাখন বের করার জন্যে এক প্রকার বিশেষ পাত্র পাওয়া যেতো। ঐগুলো কোন ভৃত্যের হাতে ভাঙ্গা গেলে তাদেরকে মনিবদের দ্বারা প্রহৃত হতে হতো। এ জন্যে ঐ পাত্রের ভগ্নাংশ কোন গরীব ভৃত্য যদি ঐ ওয়াক্ফ সংস্থার কাছে পেশ করতো, তখন তাকে সাহায্য স্বরূপ একটি মাখন তৈরির নতুন পাত্র দিয়ে দিত। ঐ যুগে "নারী কল্যাণ সংস্থার"ও অস্তিত্ব দেখা যায়। মরক্কোতে এ ধরণের একটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান ছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-কলহ যখন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতো যে, উভয়ের পক্ষে এক জায়গায় সহাবস্থান সম্ভব নয়, তখন নারীরা সেখানে গিয়ে অবস্থান করতো। সেখানে তাদের দৈনন্দিন সকল জীবনোপকরণ পৌঁছিয়ে দেয়া হতো। এভাবে সপ্তাহ বা দিন দশেক পর যখন স্বামী-স্ত্রীর ক্রোধ নেমে আসতো, তখন উভয়ে পারস্পরিক আপোসে উদ্যোগী হতো। অতঃপর স্ত্রী স্বামীগৃহে চলে যেতো। আবার কোন কোন সময় চিরদিনের জন্যেও বিচ্ছেদ ঘটতো। উক্ত ওয়াক্ফ সংস্থা মাঝখানের অর্ন্তবর্তীকালীন সময় ঐ জাতীয় পরিস্থিতির শিকার কোন মহিলাকে সাহায্য করতো।

বইটির বৈশিষ্ট্য

১. কোরআন হাদিসের আলোকে বইটিতে সামাজিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

২. বইটিতে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখক তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন।

৩. এতে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

[৩২] সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৪৮

৪. সমাজে অপসংস্কৃতির প্রভাব ও এর খারাপ ফলাফল সম্পর্কে হুশিয়ারী করা হয়েছে।

৫. বইটি লেখকের মৌলিক বই সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ বই।

❖ আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

প্রকাশক: ১ম প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৭০, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১২৩। ২য় প্রকাশ আল-ফালাহ্ পাবলিকেশন, ঢাকা,আগস্ট,২০০০।

বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতামত

আল-ফালাহ্ পাবলিকেশন, ঢাকা- এর পরিচালক এ.এম. আমিনুল ইসলাম উপরোক্ত বইটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন-

আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা কি ছিল ? এ সম্পর্কে উর্দু ভাষায় অসংখ্য বই-পুস্তক থাকলেও বাংলা ভাষাভাষী পাঠক মহল দীর্ঘদিন থেকে এ জাতীয় বই-পুস্তকের অভাব অনুভব করে আসছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সাহেব "আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা" বইখানা লেখার ফলে এ ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘদিনের অভাব অনেকাংশে পূরণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও ইংরেজদের দিল্লী দখলের পর থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত এক নজরে আলেমদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের একটি মোটামুটি চিত্র পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে।"[৩৩]

মহানবী (সা.) এর যুগ থেকে নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভূখন্ডের খোদা-বিমুখ শাসক ও রাষ্ট্রশক্তির দাসত্ব-নিগড় থেকে মানবতাকে আজাদ করার জন্যে মুসলমানগণ যে সংগ্রাম করে আসছে, সেটাই প্রকৃত আজাদী সংগ্রাম। এ সংগ্রামে তারা জয়যুক্তও হয়েছে। সারা বিশ্বে এক সময় শত শত বছর ধরে তাদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক ছিল। কিন্তু শাসকদের অনেকের আদর্শচ্যুতি, ভোগবিলাস, আত্মবিলাস ও লোভ - লালসা হেতু এ জাতি তার শাসক সুলভ মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা

[৩৩] এ.এম. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক, আল-ফালাহ্ পাবলিকেশন, ঢাকা।

খুইয়ে বসে। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম ভূখন্ড ইংরেজদের করতলগত হয়ে যায়। তারা ইংরেজ শক্তির অত্যাচার, উৎপীড়ন, জেল-জুলুম, ফাঁসিকে এতটুকুও পরোয়া না করে ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজেদের জীবন কোরবান করেও পরিচালনা করেছেন মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সর্বাত্মক আন্দোলন ও সংগ্রাম।

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের প্রথম হতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আলেম সমাজ ইংরেজ ও তাদের দোসর শিখ-হিন্দু নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছেন, তা এ দেশে ইসলামী মূল্যবোধের প্রাধান্য পুণঃপ্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক আন্দোলনেরই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ছিল।

এ অধ্যায়ে ইংরেজদের অমানুষিক জুলুম, সীমাহীন উৎপীড়ন বেপরোয়া ফাঁসীদান এবং হিন্দুদের মুসলিম নিধনযজ্ঞকে বিন্দুমাত্রও পরোয়া না করে যে মহান নেতৃবৃন্দ পাক-ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হতে আরম্ভ করে পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং প্রায় দুশ বছর অবিরাম সংগ্রামের পর ঈপ্সিত আজাদী হাসিল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী, ইসমাইল শহীদ দেহলভী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, হাজী শহীদ তিতুমীর (নেসার আলী), মওলানা বেলায়েত আলী, মওলানা ইয়াহহিয়া আলী, মওলানা জাফর থানেশ্বরী, মওলানা আহমদুল্লাহ, মওলানা মুহাম্মদ হোসাইন আজিমাবাদী, মওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী, শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান, মওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী, মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা হাসরাৎ মুহানী, মওলানা আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মওলানা আবদুল্লাহির কাফী, পীর দুদু মিঞা, পীর বাদশাহ্ মিঞা, মওলানা রুহুল আমীন, ফুরফুরার পীর মওলানা আবু বকর সিদ্দীক, শর্শিনার পীর মওলানা নেছারুদ্দীন সাহেব, মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাষানী প্রমুখ আলেমের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আর এ অধ্যায়ের শেষ প্রান্তে এসে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ হতে যে বহু ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম নেতা এ সংগ্রামে শরীক হয়ে একে অধিকতর জোরদার করে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে মাসীহুলমূলক, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, নবাব সলীমুল্লাহ, কায়েদ আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা মওলভী এ.কে. ফজলুল হক, হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

উপরোক্ত বই সম্পর্কে রিসার্চ একাডেমী, ফরিদাবাদ, ঢাকা-এর প্রধান অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল রাজ্জাক নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন :

"আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা"- পুস্তিকায় বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ইসলামী রাষ্ট্রের পুণঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এ দু'শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রামী আলেমদের গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমাদীপ্ত দুর্বার আন্দোলনের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় এ আন্দোলনের কোন বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য ইতহাস আজও রচিত হয়নি বলে লেখকের এ প্রাথমিক প্রচেষ্টা সীমিত হলেও প্রকৃতির দিক দিয়ে যেমন মৌলিক, তেমনি অবদানের দিক থেকে প্রথম সারির। বিষয় ও বিন্যাসের কোথাও কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও, পুস্তিকাখানি ইসলামী জনতার দৃষ্টিপথে তাদের শ্রদ্ধাভাজন নায়েবে নবী ওলামায়ে কেরামের চিরন্তন সংগ্রামের একটি দিক তুলে ধরবে বলেই আমার বিশ্বাস।[৩৪]

বইটি সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিব তার মতামত ব্যক্ত করে বলেন: "বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও একদিকে যেমন তা ঐতিহ্য বিস্মৃত এক শ্রেণীর ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিক ও আধুনিক শিক্ষিত যুবকের সামনে "আলেমরা এতদিন কোথায় ছিলেন?"- তার সন্ধান দেবে, তেমনি আজকের ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী তরুণ সমাজ, বিশেষ করে ওলামা ও মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে নিজেদের ঐতিহ্য চেতনায় করে তুলবে উজ্জীবিত। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত এ বইটির আমি বহুল প্রচার কামনা করি।"[৩৫]

অবিভক্ত ভারতের আলেমগণই ছিলেন উপমহাদেশের মুক্তি-আন্দোলনের পুরোধা, তাঁরাই প্রথমে মুসলমানদের যাবতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করতে গিয়ে ইংরেজ শাসকদের হাতে অকথ্য জুলুম-নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছিলেন, দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন নির্বাসিত। তাঁরাই আঘাতের পর আঘাত খেয়েও সফলতার দুর্জয় আকাঙ্খা নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বারংবার অস্ত্রধারণ করেছিলেন। আর এমনিভাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন ইসলামী প্রেরণা, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিবোধ।

---

[৩৪] মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক [প্রধান অধ্যক্ষ] রিসার্চ একাডেমী, ফরিদাবাদ, ঢাকা- ৪।

[৩৫] আবদুল মান্নান তালিব, সম্পাদক- মাসিক পৃথিবী, ঢাকা।

প্রাক-ইংরেজ আমলের ভারত

আজাদী আন্দোলনের সূচনা সম্পর্কিত আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই গোলামীর যুগ ও তার পটভূমি সম্পর্কে একটি জিজ্ঞাসা জাগে। এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে ইতিহাস থেকে আমরা এটাই জানতে পারি যে, তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতভিত্তিক ইসলামী জীবনধারা থেকে বিচ্যুতির ফলে যেমন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানরা দুর্বল ও বিদেশী দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি হিমালয়ান উপমহাদেশেও তারা মোগলপতন যুগে প্রথমে শিখ-মারাঠা কতৃক বিপর্যস্ত ও পরে ইংরেজদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসন ক্ষমতার এ দূর্বলতা লক্ষ্য করেই বণিক হিসাবে আগত ইংরেজরা এদেশের শাসক হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পরিণামে, ঘরের ইঁদুরের কারণে পলাশীযুদ্ধে ইংরেজদের হাতে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসক নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে ইংরেজরা পরাজিত ও হত্যা করে। এভাবে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে বাংলা দখল করার মধ্য দিয়েই ইংরেজদের সেই স্বপ্নসাধ পূর্ণ হতে থাকলো। পলাশী যুদ্ধের পর দিল্লী কেন্দ্রকে লক্ষ্যস্থল স্থির করে তারা ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো। একের পর এক কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম অমুসলিম শাসকদের স্বাধীন রাজ্যগুলোকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলো।

অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র নিরাশার কালছায়া নেমে এলো, আলেমগণই আজাদী আন্দোলনে এগিয়ে এলেন কোনো সফলতাই ত্যাগ, শ্রমসাধনা ও সংগ্রাম ছাড়া আসে না। বিশেষ করে জাতীয় জীবনের সফলতার ক্ষেত্রেতো কোনো অবস্থাতেই নয়। তেমনিভাবে ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত উপমহাদেশের আজাদীও বিচ্ছিন্ন কোনো আন্দোলনের ফলে আসেনি। তার পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ত্যাগ ও রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। সেই ত্যাগ-সংগ্রামই ধীরে ধীরে গোটা অবিভক্ত ভারতের আজাদীর পথকে প্রশস্ত করেছিলো। সেই সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন তৎকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ আলেম সমাজই।

ফাঁসিকাষ্ঠে ২৮ হাজার মুসলমান ও সাতশত আলেমের শাহাদাত বরণ

জিহাদে মুসলমানরা পরাজিত হলো। উপমহাদেশের মুসলমানরা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তভাবে বাঁধা পড়লো ইংরেজদের দাসত্বের জিঞ্জিরে। থানা ভবনের এলাকাকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করা হলো। বিচারের কোনরূপ অপেক্ষা না করে ভারতের অন্যান্য এলাকার মতো এখানেও প্রকাশ্য রাস্তায় নির্মমভাবে মুসলমানদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হলো। উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারদের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, এই সেক্টরে ২৭/২৮ হাজার মুসলমানকে বিনা বিচারে ফাঁসি দেয়া হয়েছে এবং প্রায় সাতশো বিশিষ্ট আলেমকে ফাঁসিকাষ্ঠে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। এছাড়া বহু ওলামা ও বুযর্গানে দ্বীন আন্দামান প্রভৃতি দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছেন। তাঁরা দেশবাসী ও আত্মীয় পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিদারুন দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়েছেন। মওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, মওলানা মুফতী এনায়েত আলী এবং শাহ্ আহমদ সাঈদ ১৮৫৭ সালের 'বিপ্লব ষড়যন্ত্র মামলায়' দণ্ডিত হন। প্রথম দু'জন মুজাহিদকে উক্ত ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্থ করে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁরা জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

বলাবাহুল্য, শুধু থানা ভবন এলাকায় যেই বিপুল সংখ্য মুসলমান ও আলেম শহীদ হয়েছেন, সে হিসাবে গোটা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ মুসলমান ও আলেম ওলামাকে শহীদ করা হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। (এক পরিসংখ্যান মোতাবেক আজাদী হাসিল পর্যন্ত ২০ লক্ষ মুসলমান এই মুক্তি সংগ্রামে দুশমনদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

এরপর দেওবন্দের সংগ্রামী নেতা শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান এর ভূমিকা এবং অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম হেড মুদার্রিস ছিলেন হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব। তারপর এই পদে দায়িত্ব পালন করে হযরত মওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলভী। অতঃপর শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দারুল উলুমের হেড মুদার্রিস নিয়োজিত হন (১২০৮-১২৩৩ হিঃ)। শায়খুল হিন্দ সংগ্রামী নেতা মওলানা কাসেম নানতুবী ও রশিদ আহমদ গংগূহীর শিষ্য ছিলেন বলে তিনি দেওবন্দ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তার শিষ্যরা ছিলেন উপমাদেশের রাজনৈতিক গগনের এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

শায়খুল হিন্দ এর বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ

১. আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (মোহাদ্দেস ও হেড মোদার্রিস দারুল উলুম দেওবন্দ, সভাপতি জমইয়তে ওলামায়ে হিন্দ) ।

২. মওলানা ওবায়দুলাহ সিন্ধী

৩. মওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী

৪. মওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (সভাপতি জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দ)

৫. মওলানা মুহাম্মদ মিঞা ওরফে মওলনা মনসুর আনসারী

৬. মওলানা হাবীবুর রহমান (সাবেক মোহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ)

৭. আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ ও হেড মুদার্রিস দারুল উলুম দেওবন্দ, শায়খুল ইসলাম পাকিস্তান ও সভাপতি জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম ।)

৮. শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ্, মওলানা মুহাম্মদ ইযায আলী, দারুল উলূম দেওবন্দ ।

৯. মওলানা ফকরুদ্দীন আহমদ (শায়খুল হাদীস জামেয়ায়ে কাসেমিয়া, মুরাদাবাদ)

১০.মওলানা ইবরাহীম বিলইয়াবী (অধ্যাপক দারুল উলুম দেওবন্দ)

১১.মওলানা আবদুস সামী (অধ্যাপক দারুল উলুম দেওবন্দ)

১২.মওলানা আহমদ আলী (মুহতামিম আঞ্জুমানে খুদ্দামুদ্দীন শিরীনওয়ালা, লাহোর)

১৩.মওলানা মুহাম্মদ সাদেক, করাচী, প্রমুখ ।

ভারত স্বাধীনতার প্রথম প্রস্তাবক সম্পর্কে তিনি বলেন, আলেমরাই কংগ্রেসের দশ বছর আগে ভারত স্বাধীনের প্রস্তাব দেন । জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ কর্তৃক সর্বপ্রথম ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রথম ভারত স্বাধীনতার দাবী তোলার দশ বছর পর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস এ প্রস্তাব গ্রহণ করে । জমিয়তের প্রস্তাবের ১৭ বছর পর ১৯৩৬ সালের ১৭ই অক্টোবর মরহুম কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে ভারত স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় । অনেকেই

ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা বশতঃ মনে করে থাকেন যে, কংগ্রেসই বুঝি আজাদীর চুড়ান্ত পর্যায়ে প্রথম ভারত স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়েছিল।

অতঃপর বাংলার আলেম সমাজ আজাদী আন্দোলনে যে ভূমিকা রেখেছিলেন সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঐ সময় বাংলাদেশে মওলানা থানভীর বিশেষ শিষ্য মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও প্রখ্যাত সংগ্রামী আলেম মওলানা আতহার আলী সাহেব মুসলমানদের আলাদা বাসভূমি পাকিস্তানের জন্য বিরাট কাজ করেন। মওলানা জা'ফর আহমদ ওসমানী, মওলানা সোলায়মান নদভীকে নিয়ে মওলানা আতহার আলী সাহেব সিলেট গণভোটের প্রাক্কালে পাকিস্তানের স্বপক্ষে সভা-সমিতির মাধ্যমে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেদিন তাঁরা এগিয়ে না এলে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রভাবিত সিলেট পাকিস্তানভূক্ত হতো কি না সন্দেহ। পাক-বাংলার প্রখ্যাত যুক্তিবাদী আলেম চট্টগ্রামের মওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেবও সে সময় আজাদী আন্দোলনে বক্তৃতা, সভা-সমিতির মাধ্যমে অনেক কাজ করেন। মওলানা থানভীর শিষ্য বাংলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযর্গ হাফেজজী হুযুর (মওলানা মোহাম্মদুল্লাহ সাহেব) ও পীরজী হুযুর (মওলানা আবদুল ওহাব সাহেব)- ও তাঁদের ভক্ত অনুসারীদের নিয়ে কাজ করে যান।

বইটি তিনি ভাসানীর জীবনের শিক্ষা ও তাঁর সংগ্রাম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। যে কোন সমাজে কোন আদর্শ বাস্তবায়নের দ্বারা ঐ সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে সেই আদর্শকে প্রথমে সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষের কাছে পরিচিত করতে হয়। উক্ত আদর্শের বাস্তবায়ন দ্বারা জনগণের কি কি কল্যাণ সাধিত হয়, সেটা বোধগম্য ভাষায় তাদের কাছে তুলে ধরতে হয়। অন্যথায় আদর্শের ধারক-বাহকরা সংশ্লিষ্ট সমাজের শত কল্যাণকামী হলেও জনগণ কখনও তাদেরকে নিজেদের শুভাকাঙ্খী মনে করেনা। তাদের প্রতি বাহ্যিকভাবে সম্মান জানালেও সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের আসনে বসার সুযোগ তাদেরকে কখনও তারা দেবেনা। আদর্শের প্রচারকদের কর্তব্য হলো নিজের কথা, আচার-আচরণ ও একই সঙ্গে চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা জনচিত্তকে জয় করা। বলাবাহুল্য, মওলানা ভাসানী তাঁর গোটা সংগ্রামমূখর জীবনে জনপ্রিয়তার যেই উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাসীন ছিলেন, এর পেছনে তাঁর উল্লেখিত গুণাবলীই কাজ করেছিল। সমাজের সাধারণ মানুষ সব সময় এই অনাড়ম্বর মহান ব্যক্তিত্বকে দেখেছেন নিজেদের আপন মানুষ হিসাবে। তাদের দুঃখ দুর্গতির কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে এবং এজন্যে দায়ী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও হুশিয়ারি উচ্চারণ করতে। তারা দেখেছে, ক্ষমতায় না গিয়েও এই নিঃস্বার্থ মজলুম জননেতা সকল সময় তাদের সমস্যাবলী নিয়েই দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত

পর্যন্ত সভা করে বেড়াতে এবং অত্যাচারী শাসকদের সন্ত্রস্ত করে রাখতে। সবচাইতে বড় কথা হলো, মওলানা ভাসানী এদেশের মানুষের কল্যাণে তাদেরকে যে কথা বলতেন, তারা সে কথা বুঝতো। পক্ষান্তরে একই 'মওলানা' লকবে ভূষিত আরও বহু আলেম যারা নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে এ দেশ-জাতির সেবা করে আসছেন এবং তাদেরই-পরলৌকিক মুক্তির সন্ধান দিচ্ছেন, তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ দেশবাসীর হৃদয় সে রকম জয় করতে পারেননি, যেমনটি পেরেছিলেন মওলানা ভাসানী। অথচ তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় ও বৈষয়িক বড় বড় এমন পণ্ডিতও ছিলেন ও আছেন, যাদের ইলমের পরিধি হয়তো মওলানা ভাসানীর চাইতেও অনেক ব্যাপক ছিল। এর কারণ সম্ভবত সাক্ষাত জনসেবামূলক কাজ ভাসানী অধিক করেছেন আর যা বলেছেন জনগণের সাক্ষাত সমস্যার সমাধানে তাদের বোধগম্য ভাষায় বলেছেন। জনগণের জন্য কথা বলে জেল খেটেছেন।

বইটির বৈশিষ্ট্যঃ

১. বইটিতে ইংরেজদের অকথ্য জুলুম নির্যাতনের কথা উল্লেখ আছে।

২. উপমহাদেশের জনগণকে মুক্ত করার ব্যাপারে আলেমদের ভূমিকা কী ছিল তার উল্লেখ আছে।

৩. মুসলমানদের অতীত গৌরবময় ইতিহাসের বর্ণনা আছে।

৪. শিক্ষিত, আলেম ও যুবকদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

❖ এই সময় এই জীবন

প্রকাশক: মিজান পাবলিশার্স, ৩৮/৪, বাংলা বাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল: ২১ শে বইমেলা, ২০০৬

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৩৬

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর 'এই সময় এই জীবন' গ্রন্থটি মূলত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। এই গ্রন্থে রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, দর্শন, সমাজ চরিত্র, সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে ছোট বড় মোট ৮১টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রতিটিই প্রবন্ধ যুগোপযোগী ও

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে লিখিত। লেখনির মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে জাতির কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে আমি তাঁর প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের মাত্র ৪টি প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করবো।

"মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র" শিরোনামে প্রবন্ধটিতে মাওলানা কিসমতী বলেন, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরি শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে। দুশমনের জন্য যেই যুগের উপযোগী যেই অস্ত্র ব্যবহার করা দরকার, তারা সে যুগে সেই অস্ত্রই ব্যবহার করে আসছে। কখনও মিথ্যা প্রচারণা, কখনও প্রত্যক্ষ লড়াই, কখনও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে যেখানে দেখেছে আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক মাধ্যমকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছে। এজন্যে আধুনিক যুগে তারা নিজেদের প্রভাব বলয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা নীতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের চিন্তা চেতনাকে নিজেদের অনুকূলে গড়ে তোলার ষড়যন্ত্রটিকে সফলভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। এর বড় প্রমাণ হলো ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর ঐ দর্শন ও দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা নীতি গড়ে তোলা। তখন যেমন তারা মনে করেছিল যে, দীর্ঘ ১শ' বছরের শাসনেও যখন মুসলমানদেরকে তাদের জীবনাদর্শ মূল্যবোধ ও স্বকীয় চেতনা থেকে বিচ্যুত করা যায়নি, তাই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামের প্রাণ সত্তাকে সংকোচিত করতে হবে। তাই এখানে পশ্চিমের জড়বাদী ধ্যান-ধারণা সম্বলিত শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা নীতি গোটা ভারতে চালু করেছিল। বর্তমানেও তারা ইসলাম বিরোধী শত চক্রান্ত সত্ত্বেও বিশ্বময় ইসলামী জাগরণ দেখে সেই অভিন্ন কারণ ও অভিন্ন লক্ষ্যে সারা মুসলিম দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের আদলে গড়ে তোলার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে।

মুসলিম বিশ্বে সামরিক, আধাসামরিক, একনায়কদের শাসন বিদ্যমান। এছাড়া মুসলিম শাসকদের প্রায় ক্ষেত্রে চেহারা দেখা যায় দু'রকম। একটি জনগণকে দেখাবার জন্য, অপরটি পশ্চিমাদের দেখাবার জন্য। প্রথমোক্ত চেহারাটা অনেকেরই ভীতিপ্রদ এবং কঠোর। শেষোক্ত চেহারাটি হচ্ছে নতজানুর চেহারা। পিছে হটার চেহারা, যাকে তারা কর্মকুশলতা নামে আখ্যায়িত করতে অভ্যস্ত।

সঙ্গত কারণেই বলতে হয় যে, যারা আজ আমেরিকার চাপে নিজ দেশের পাঠ্য পুস্তককে ইসলামের প্রভাবমুক্ত রাখার জন্যে নতুন করে তাতে পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়েছে, আল্লাহ না করুন, তারাই আগামীতে গিয়ে আমেরিকার চাপের মুখে কুরআন-হাদীসের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে

পারেন। কোন এক সময় এই বিষয়টিও চিন্তা করা হতো বৈকি, কিন্তু আজকাল যা ঘটছে, তা সকলেরই সমান। মুসলিম বিদ্বেষী বৈরি শক্তিগুলো এ ব্যাপারে আগে থেকেই হৈ-চৈ শুরু করে আসছিল। ভারতের বিজেপির বিশিষ্ট নেতা একাধিকবার বলেছেন যে, কুরআনের বেশ কিছু আয়াত বাদ দিতে পারলেই মুসলমান-হিন্দু, মুসলিম-বৌদ্ধ সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আমেরিকা ইউরোপে এই দৃষ্টিভঙ্গির লেখা অব্যাহতভাবে প্রকাশ পেয়ে আসছে। ঐ সব লেখায় মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহের উপরও হামলার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। বলা হয়, সম্পর্কের পথে মুসলমানদের আসল সমস্যাতো হলো একমাত্র কুরআন। এই কুরআনই মানুষকে (নাউযুবিল্লাহ) চরমপন্থী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

মুসলিম বিশ্বে পাঠ্য তালিকার পরিবর্তন একটি সাধারন বিষয় নয়। এটা রীতিমতো সরাসরি মুসলমানদের ঈমান আকীদা ও ধর্মীয় চিন্তাধারা উপর এক আগ্রাসী হামলা। বর্তমানে একরকম সারা দুনিয়াই রক্তরঞ্জিত। কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, ভারত সর্বত্র মুসলমানের রক্তে লালে লাল। আফগানিস্তান, ইরাক ও আমেরিকার দখলে। তবে আমাদের দৃষ্টিতে আমেরিকার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তনটি এ ধরণের দেশ দখলের চাইতেও ভয়াবহ ও মারাত্মক। কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মানুষ তৈরির কারখানা। পাশ্চাত্য গত দু'শ বছর ধরে মুসলমানদেরকে সেক্যুলার অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে আমেরিকার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তনটি এই ধরণের দেশ দখলের চাইতেও ভয়াবহ ও মারাত্মক। কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মানুষ তৈরির কারখানা। পাশ্চাত্য গত দু'শ বছর ধরে মুসলমানদেরকে সেক্যুলার অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরী মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষ ও লিভারেল করে গড়ে তোলার যেই শিক্ষা দিয়ে আসছিল, সেই শিক্ষাও লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট মনে করছেনা। তাই এ জন্যে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের অনুগত করে তুলতে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে আরও গভীর থেকে ধ্বংস করতে হবে। সুতরাং ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ঈমানী দুর্বলতার শিকার মুসলিম শাসকদের দ্বারা এখন তারা প্রতিটি মুসলিম দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্য তালিকা সংশোধনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিক থেকে যেই কোন মুসলমানের মধ্যে ধূলিকণা ঈমান থাকলেও এটাকে তার জন্যে এক চ্যালেঞ্জ মনে করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে শুধু বক্তৃতা-বিবৃতিতে কাজ হবে না এ জন্যে বাস্তব কাজ প্রয়োজন।

সৌদি আরবে মাওলানা কিসমতী এই সময় এই জীবন বইটির আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ লেখা হলো ‘গুরু অপরাধে’ ‘গুরুদণ্ড’ দান প্রসঙ্গে” এখানে লেখক ইসলামী আইনের আলোকে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন, আজকাল উন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত সকল দেশে, সকল সমাজেই অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেছে। সময়ের বিবর্তনে এবং অপরাধের বিচিত্র কার্যকারণে সংঘটিত হচ্ছে বিচিত্র ধরণ ও চরিত্রের বিচিত্র অপরাধ। বিশেষ করে পরকাল ও সে জগতে জীবনের সকল কার্যক্রমের জবাবদিহিতার ওপর আস্থাশীল সমাজগুলোতে যেখানে অপরাধ প্রবণতা ছিল অতি কম, এখন সেসব সমাজেও অপরাধের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিকারী চেতনাকে বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করে দেয়াতে নানান প্রকার অপরাধ প্রবণতা অতি তুঙ্গে সমাসীন হয়েছে। অপরাধ প্রবণতার এই বেগবান স্রোতের মধ্যে পড়ে সকল সমাজের মানুষই আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। অভিভাবক মহল নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের নিয়ে খুবই চিন্তিত। কিন্তু অপরাধ সংক্রান্ত ঐ সমস্ত সমাজ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে সৌদি আরব বহুলাংশে অপরাধ প্রবণতামুক্ত। দেশটিতে অপরাধের কোনো ঘটনা সংঘটিত হলেও অপরাধীকে তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করে আল কুরআনে বর্ণিত খোদায়ী আইন মোতাবেক প্রকাশ্য জনতার উপস্থিতিতে শাস্তি দেয়া হয়। অপরাধ দমন ও অপরাধ হ্রাসে ইসলামী আইনের এই সাফল্য ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তি বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা তাদের তল্পীবাহক, সুবিধাভোগী ভাবশিষ্যদের সহ্য করার কথা নয়। তাই অনেক সময় এই শ্রেণীর লোক নানান ভণ্ডামির মাধ্যমে এ আইনের বিরুদ্ধেসমালোচনামুখর হয়ে উঠে। সৌদি আরবে দু’একটি গুরুতর অপরাধীকে কুরআনের আইন মোতাবেক শাস্তি দেয়া হলেও ইসলামী আইনের সমালোচকরা অন্য দেশে তার সমালোচনা করে। তখন সৌদি সরকার তার জবাব দেন। খোদ খাদেমুল হারামইন শরীফাইন সৌদি বাদশাহ্ ফাহাদ-বিন-আব্দুল আজিজ বলেছিলেন, “ইসলামই হচ্ছে মানবাধিকারের সর্বোত্তম গ্যারান্টি।”[৩৬]

বিশ্ববাসী বহু আগে থেকেই এ ব্যাপারে অবহিত যে, সৌদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সূচনালগ্ন থেকেই সেখানে পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত আল্লাহ প্রদত্ত অপরাধ দণ্ডবিধি জারি রয়েছে। কারণ, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা মদীনার রক্ষক তথা সৌদি আরবের শাসক মহলের এটা দৃঢ় ঈমান যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত একমাত্র খোদায়ী জীবন দর্শন ও তাঁর অবতীর্ণ বিধি-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন দ্বারাই মানব সমাজে যথার্থ ন্যায়-বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিশেষ করে অপরাধ দমন আইন যাকে সৌদি আরবে

[৩৬] এই সময় এই জীবন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৯

সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে আসা হচ্ছে, এ আইন ছাড়া মানব রচিত কোনো আইন ও জীবন দর্শনের সাহায্যে মানব সমাজ থেকে কার্যকরভাবে অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণ সম্ভব নয়। বাস্তবেও তার সত্যতা প্রমাণিত। কারণ, এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর যত অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে, সে তুলনায় সৌদি আরবে অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা বহু কম। এটা একমাত্র কুরআনে বর্ণিত খোদায়ী আইনের বরকতেই সম্ভব হয়েছে।

ইসলামের খোদায়ী আইন সর্বকালের সর্বযুগের শাশ্বত চিরন্তন আইন। নিরপেক্ষ আইন। মানব রচিত আইন বহুলাংশেই পক্ষপাতদুষ্ট। ইসলামী আইন বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক আইন। কারণ মানবদেহের কোনো অঙ্গ যদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তখন বিজ্ঞ চিকিৎসাবিদ এজন্যে সেই অঙ্গটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন যেন সেটি মানবদেহের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি করতে না পারে। তেমনি সমাজদেহের অঙ্গরূপ কোনো নাগরিক যদি চরিত্র, চিন্তা ও মননের দিক থেকে এতোই অপরাধ প্রবণতার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় যে তাকে 'অপারেশন' করে সমাজদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা না হলে গোটা সমাজই সেই রোগযন্ত্রণায় ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন সমাজদেহে সেই অঙ্গ তথা অপরাধী ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিচারের পর মৃত্যুদণ্ড না দেয়াটা প্রকারান্তরে গোটা সমাজকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর।

কুরআন-হাদীসের আলোকে মহানবী (সা.) এর মিরাজ গমনের কাহিনী উল্লেখ করে, মাওলানা কিসমতী এই লেখাটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। লেখাটির শিরোনাম ছিল "মিরাজের বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রসঙ্গ।

প্রত্যেক নবী-রাসূলের জীবনেই কিছু কিছু মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা থাকে। শেষ নবী (সা.) এর জীবনের মুজিযাসমূহের মধ্যে মি'রাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা বললেও যথেষ্ট নয়। কাজেই মি'রাজের বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজতে যাওয়া একটি অবান্তর চিন্তা। মি'রাজ নবী- জীবনের এমন একটি ঘটনা, যার সাথে রয়েছে ঈমানের গভীরতম সম্পর্ক। এ সম্পর্কের কারণেই এ ঘটনা শোনামাত্র কোনো সাহাবী কিছুটা ইতস্তত করতে থাকলেও হযরত আবু বকর (রা.) নির্দ্বিধায় বলে উঠলেন: আল্লাহর রাসূল যদি একথা বলে থাকে, তা হলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত ঈমানের এই কামালিয়াতের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন বলেই তিনি 'সিদ্দীক-ই-আকবর' রূপে চিরদিন অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেনও।

বলাবাহুল, যুক্তি কোনদিনই ঈমানের ভিত্তি নয়- ঈমানই হচ্ছে যুক্তির ভিত্তি। বরং যুক্তির ক্ষমতা যেখানে শেষ ঈমানের যাত্রা সেখান থেকেই শুরু। তারপরও কোনো কোনো মহৎ ব্যক্তির এ ব্যাপারে যুক্তির অবতারণা সেটা শুধু ঈমানের স্বাদ অনুভব করার জন্যই। যেমন- আল্লাহ কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পূর্ণ ঈমান থাকা সত্ত্বেও নিজের স্পৃহা দমন ও মনের আকাংখা পূরণের উদ্দেশ্যে তার বাস্তব দৃশ্য দেখার জন্যে তিনি আল্লাহর কাছে আবদার করেছিলেন।[৩৭] আর আলাহও তাঁর সেই আবদান পূরণ করেছিলেন।

বুরাক কথাটি 'বারকুন' থেকে গঠিত। এর অর্থ বিদ্যুৎ। মধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করার জন্যেই হয়তো বৈদ্যুতিক গতি শক্তি বিশিষ্ট এই বুরাক প্রেরিত হয়। বিজ্ঞান ইসলামের অনেক কিছুকেই বর্তমানে যুক্তি গ্রাহ্য করে দিয়েছে, যা শত শত বছর ধরে সম্পূর্ণরূপে জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানহীন লোকদের কাছে অযৌক্তিক ছিল। হাদীসের মর্ম অনুযায়ী, মৃতকে কবরস্থ করা হলে সেখানে শেষ নবীকে উপস্থিত করে ফিরিশতা কর্তৃক তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসার ব্যাপারটিও একদিন অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। কারণ সওয়াল-জওয়াবের সময় এক নবী সত্তাকে বহুস্থানে কি করে পেশ করা হবে? কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার-টিভি তার সম্ভাব্যতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তেমনি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের প্রতিটি কথা সংরক্ষিত রাখা হয়। এ ব্যাপারেও কারও কারও জিজ্ঞাসা ছিল যে, এটা কি করে সম্ভব? তার জনাব আজকাল টেপরেকর্ড-সিডি-ভিসিডি থেকে সহজেই পাওয়া যায়। কাজেই মি'রাজের ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও এর বাস্তবতা প্রশ্নাতীত।

মি'রাজ সশরীরেই হয়েছেঃ আল্লাহ তায়ালার যেই বাণীটির দ্বারা মি'রাজের ঘটনা সত্যায়িত, সেই বাণীতে তিনি মহানবী (সা.) কে তাঁর 'আব্দ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى "পূত পবিত্র মহান শক্তিধর সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের সামান্যতম অংশের মধ্যে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত সফর করিয়েছেন।"[৩৮]

মহান আল্লাহ্ শেষ নবীর মি'রাজের মাধ্যমে মানব জাতির জন্যে সার্বজনীন ১৪টি মূলনীতি সুরা বনী ইসরাইলে ঘোষণা করেছেন, যেগুলো একটি সার্থক সমাজ বিপ্লবের জন্যে একান্ত জরুরী। মি'রাজ

[৩৭] হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর এই ঘটনাটি সূরা আল-বাকারাহ্ এর ২৬০নং আয়াতে বর্ণিত আছে।

[৩৮] সূরা বনী ইসরাইল, আয়াতঃ ০১

দিবসের শিক্ষা আদর্শের চর্চা এবং এর মূল লক্ষ্যকে সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করণে ও আমাদের সার্বিক মুক্তি আনয়নে তখনই সহায়ক হবে, যদি আমরা এ ব্যাপারে আপোষহীন হই।

একটি দেশের উন্নতি অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক শক্তি খুবই মজবুত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে মাওলানা কিসমতীর নিম্নোক্ত শিরোনামে লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের রাজনৈতিক কর্মসূচি জনগণের আদৌ কাম্য নয়।

ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার সতর্কতা অবলম্বন ও এ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণের জন্যেই ইতিহাস। মানুষ যুগে যুগে দেশে দেশে এজন্যে নিজেদের ইতিহাস সংরক্ষণ করে আসছে। কিন্তু অনেক সময় পরশ্রীকাতরতা, প্রতিশোধ স্পৃহা, অহংবোধজনিত ভ্রান্ত আত্মমর্যাদাবোধ কিংবা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে ক্ষমতার উগ্র বাসনা মানুষকে এ চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ফলে ইতিহাসের শিক্ষাবিস্মৃত এ শ্রেণীর ভাবপ্রবণ অদূরদর্শী মানুষদের দ্বারাই সংশ্লিষ্ট জাতির ইতিহাসে নতুন বিপর্যয়ের ঘটনা এসে সংযোজিত হয়। অবিভক্ত ভারতকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির আন্দোলন যখন অব্যাহত তখনও ইংরেজদের ভারত ছাড়ার চূড়ান্ত কোনো লক্ষণ সামনে আসেনি, সে সময়ও বাংলাদেশের মানুষদের অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে দাবিয়ে রাখার চিন্তা লক্ষ্য করা গেছে। আজও আমাদের রাজনৈতিক মহলের কোনো কর্মসূচী দিতে একথা বিশেষভাবে ভাবতে হবে যে, সেই দূর অতীত থেকে যারা বাংলার এই অঞ্চলের মানুষদেরকে নিছক জীবনদর্শনগত কারণে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানান উপায়ে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, সরকার বিরোধী আন্দোলন বা কোনো কর্মসূচীর নামে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে সেই ষড়যন্ত্র জালেই আমরা পেঁচিয়ে পড়ি কিনা।

সুতরাং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এই আত্মঘাতী আন্দোলন ও কর্মসূচী থেকে কেন বিরত থাকতে হবে, এই জন্যে সংক্ষেপে সেই ইংরেজ আমল থেকে যারা এদেশের উপর সর্বাধিক প্রভুত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলদেশের জনগণের ক্ষতিসাধন করে আসছে। তাদের বিদ্বেষাত্মক সে সব কর্মকান্ডের কিছুটা চিত্র এখানে তুলে ধরা অত্যাবশ্যক। যেমন- ইংরেজদের সাথে যোগসাজশে মুসলমানদেরকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা। ১) হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ফান্ডের সাহায্য থেকে মুসলিম ছাত্রদের বঞ্চিত করা এবং এ থেকে শুধু হিন্দু ছাত্রদেরই বৃত্তি প্রদান করা। ২) জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার মুসলিম ছাত্রদের জন্যে বন্ধ রাখা। ৩) সংশ্লিষ্ট সরকারী উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটির

নাম 'হিন্দু কলেজ' রেখে চরম সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দেয়া, যা পরে নবাব আব্দুল লতীফ কর্তৃক বহু চেষ্টার বিনিময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে রুপান্তরিত হয়। ফলে সেই থেকে সাথে সাথে এবার সেখানে মুসলিম ছাত্রদের জ্ঞান আহরণেরও সুযোগ ঘটে। ৪) ১৮৫৭ সালে ইংরেজ বিরোধী লড়াইয়ে মুসলমানরা কিছু গাদ্দারের কারণে পরাজিত হওয়ায় তাদের ওপর অপরিসীম জুলুম– নিপীড়ন চলে। সেই সূত্র দেখিয়েও হিন্দু নেতৃত্ব ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সরকারী চাকরি সকল দিক থেকে বঞ্চিত করে পথে বসিয়ে দেয়। তাদের সকল সম্পদ - সম্পত্তি এক রকম হিন্দু জমিদার মহাজনদেরই হাতে তুলে দেয়া হয়। ৫) অনেক দিন পর স্যার সৈয়দ নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক স্বাভাবিকতায় আনার পর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ১৯০৫ সালে বৃহত্তর "ব্যাঙ্গল প্রেসিডেন্সি" কে ভাগ করে ঢাকায় রাজধানীসহ অবহেলিত "পূর্ব বাংলা ও আসাম" নামক একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এর ফলে মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলার মানুষের উন্নতি- অগ্রগতির পথ বহুলাংশে উন্মুক্ত হয় দেখে হিন্দু জমিদার ও রাজনীতিকরা এর বিরুদ্ধে আদা পানি খেয়ে লাগে। সম্প্রদায়ের লোকদের সংগঠিত করে উপেক্ষিত এই এলাকার মুসলিম স্বার্থ রক্ষার সহায়ক "পূর্ব বাংলা আসাম" প্রদেশ বাতিল ঘোষণা করার জন্য হিন্দু নেতৃত্ব ইংরেজ সরকারের উপর হিন্দু নেতৃত্ব তাদের প্রচন্ড চাপ দেয়। শেষ পযর্ন্ত বাংলাদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক হিংস্র সংকীর্ণ চিন্তারই জয় হয়। ইংরেজ সরকার মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতাদের মন রক্ষার জন্যে এই ন্যায্য সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত বাতিল ঘোষণা করে। "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ" বাতিল ঘোষণায় এই এলাকার জনদরদি মুসলিম নেতা নবাব স্যার সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ অতীব ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেন। ইংরেজ সরকার তখন মুসলমানদের অসন্তোষ দূর করার জন্যেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। ৬) কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রিয় হিন্দু জমিদার নেতারা মুসলিম প্রধান এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়াটাও সহ্য করতে পারেননি। এর বিরুদ্ধে তারা উঠে পড়ে লাগেন।

বৃটিশ শাসিত বাংলার এই অঞ্চলের জনগণ জমিদার মহাজনদের শোষণের ক্ষেত্র ছিল। অধিকাংশ প্রজা ও ঋণগ্রহীতা মুসলমান ঐসব হিন্দু জমিদার মহাজনের শোষণে এক দুর্বিসহ জীবন- যাপন করতো। তাদের সোজা হয়ে দাঁড়াবার কোনো উপায় ছিল না। এতে হিন্দু- মুসলিম সর্ম্পকও প্রভাবিত হয়। "ব্যাঙ্গল প্যাক্টের" মাধ্যমে সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের প্রতি সুবিচারের চেষ্টায় চিত্তরজন দাসের

মতো উদার নেতারা কিছুটা চেষ্টা করলেও উগ্রপন্থী অধিকাংশ হিন্দু নেতৃত্বের মুসলিম বিদ্বেষের দরুন সেই উদ্যোগও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বলাবাহুল্য, আজ মুসলিম নামের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কারণে- অকারণে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেসব বুলি চালান এবং এর নামে এখানকার ইসলামপন্থী জনতা ও ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুকৌশলে বিষোদগার করে থাকেন, তাদের ঐসব ইতিহাস না জানার কথা নয় তবুও বোধগম্য কারণেই 'সাম্প্রদায়িকতা' বলে তাদের এই চিৎকার তুলতেই হবে। কারণ গরজ বড় বালাই।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগেই ১৯০৬ সালে ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ গঠিত হয়। কংগ্রেস নেতাদের মুসলিম স্বার্থবিরোধী উল্লেখিত মনোভাব লক্ষ্য করেই কংগ্রেস ত্যাগ করে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পরে এই মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাস ভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যার পূর্বাঞ্চল পূর্বপাকিস্তান নামে অভিহিত ছিল। যা না হলে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারতাম না এবং আমাদের দুর্গতি কাশ্মীরী ও গুজরাটী মুসলমানদের চাইতেও হয়তো আরও করুণ হতো।

বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থবিরোধী এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষা- সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দাবিয়ে রাখার জন্যে একশ্রেণীর হিন্দু নেতৃত্ব ও তাদের তৈরী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের যেই মানসিকতা উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, কাল-পরিক্রমার এত বিবর্তনের মধ্যদিয়েও তাতে পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ আজও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বিশেষকরে ঐ মানসিকতার যারা উত্তরাধিকার বহন করে বর্তমানে এদেশের রাজনৈতিক ও শিক্ষাঙ্গনে তাদের সক্রিয় বিচরণ কম নয়। বিশেষ করে মুসলিম নামের যারা জ্ঞাত- অজ্ঞাতসারে ঐ মানসিকতা ঘোষণাকারীদের সুরে সুর মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজকাঠামোকে ভিন্নভাবে পূনর্বিন্যাস করতে সক্রিয় এবং তাদের কোনো আন্দোলন ও কর্মসুচী নিয়ে ইতিহাস সচেতন এদেশের কোনো মানুষ চিন্তা না করে পারে না।

বইটির বৈশিষ্ট্যঃ

১. বইটি মূলত ৮১টি প্রবন্ধের সংকলন।
২. এতে সমাজনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
৩. বইটিতে অনেক বিখ্যাত লেখকের রেফারেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৪. এতে নারীদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
৫. বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
৬. বইটির কভার পেইজ খুবই চমৎকার।
৭. বইটির ভাষা প্রাঞ্জল, সহজ ও সাবলীল।
৮. বইটির মুদ্রণে সেরকম ত্রুটি নেই।

❖ দার্শনিক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা

প্রকাশক: আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল: আগষ্ট, ২০০০

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭২

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর ছোট বইগুলোর মধ্যে এটি একটি জীবনীধর্মী বই। বইটিতে তিনি দার্শনিক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) এর জীবনী ও শিক্ষা আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে এ উপমহাদেশে শেষ মোগল শাসকদের আমলে মুসলিম আধিপত্যের অবসান ঘটার পর ইংরেজ প্রভুত্ব ও বিভিন্ন কুসংস্কার, ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মুসলিম সমাজের শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও কি করে তাঁর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে ইসলামী পুণর্জাগরনের সূত্রপাত হয়, সেদিকটিই বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

বইটিতে লেখক এই উপমহাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, একদিকে ইসলামের ব্যাপারে সুষ্ঠু জ্ঞান-গবেষণার অভাব, অপরদিকে নিত্য নতুন ভ্রান্ত চিন্তাধারার উদ্ভব- এ উভয় অবস্থার মধ্য দিয়ে যখন ইসলাম গতিশীলতা হারিয়ে দ্বাদশ হিজরিতে পদার্পণ করে তখন পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।

তিনি উল্লেখ করেন, ৯৯০ হিজরীতে 'দ্বীনে ইলাহী' প্রতিষ্ঠার সরকারী ঘোষণা দেন সম্রাট আকবর। তাঁর এই গোমরাহীর পশ্চাতে ইসলাম সম্পর্কে তার অজ্ঞতার সাথে সাথে তাঁর অমুসলিম বেগমদের গভীর প্রভাবও কাজ করেছিল। হেরেমে হিন্দু রমণীদের অস্তিত্ব গোটা পরিবেশকে হিন্দু বানাবার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁর প্রতি সম্মানসূচক সিজদা করার ফতোয়া দিয়েছিল তার দরবারের আলেম সমাজ।

আকবরের শাসনামলে মখদুমুল মূলক ও আবদুন নবীর মতো ওলামায়ে ছু'- অসৎ আলিমরা[৩৯] উক্ত ফতোয়ায় দস্তখত করে নিজেদেরকে যে কঠোর শাস্তির যোগ্য করেছে, তাদের সাথে মহান আল্লাহ কি ধরণের ব্যবহার করবেন সেটা তিনিই ভাল জানেন।

লেখক সে সময়ের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, মাদ্রাসাগুলোতে 'শামসে বাজেগা' ও 'কাযী মুবারক' বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পঠিত হলেও কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণার প্রতি কারুরই ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তৎকালীন সাধারণ শিক্ষা তথা 'দরসে নিজামী'[৪০] থেকে যদি কোন বিষয় পাঠ্যের বহির্ভূত থেকে থাকে, তা ছিল কুরআন মজীদ। বড় বড় আলেমদের শিক্ষা চক্রেও একমাত্র 'মিশকাত শরীফ' ও নূরুল আনওয়ার' পড়ানোকেই যথেষ্ট মনে করা হতো।

এরপর মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী "শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর জীবনী" উল্লেখপূর্বক সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কিত সমালোচনামূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন।

সুফীবাদের একটি ত্রুটির সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "অনুভূতির পূজা: সুফীদের জনপ্রিয়তা ও তাদের ভক্তদলে শামিল হবার কারণে এর উদ্ভব হয়েছে। মাশরিক ও মাগরিবের সমগ্র এলাকায় এ জিনিসটি ছেয়ে আছে। এমনকি সুফীদের কথা ও কর্ম সাধারণ মানুষের মনের উপর কুরআন ও সুন্নাহ তথা সবকিছুর চাইতে অধিক আধিপত্যশালী। তাদের তত্ত্বকথা ও ইঙ্গিতসমূহ এত বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, কেউ এগুলোকে অস্বীকার কিংবা এর প্রতি আমল না দিলে সে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না এবং 'নেককার' ও মুত্তাকীদের মধ্যে গণ্য হয় না।

অত:পর তিনি অযোগ্য পীর ও পীরজাদাদের কঠোর সমালোচনার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। "কোন যোগ্যতা ছাড়াই যেসব পীরজাদা বাপ-দাদার গদীনশীন হয়েছে, তাদেরকে আমি বলি: "তোমরা কেন এসব পৃথক পৃথক দল গঠন করে রেখেছো? তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথে (তরীকায়) চলছো কেন? আল্লাহতায়ালা মুহাম্মদ (সা.) কে যে পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন সেটি পরিত্যাগ করেছো কেন? তোমাদের প্রত্যেকে এক একজন ইমামে পরিণত হয়েছ। মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করছ। নিজেদেরকেই হিদায়াত দানকারী ও হিদায়াতকারী মনে করছ অথচ নিজেই মানুষকে পথভ্রষ্ট

---

[৩৯] বিভিন্ন যুগের বিকৃত ঈমান ও বিকৃত আমলের আলেমদেরকে 'ওলামায়ে ছু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাযকিরা, পৃষ্ঠা: ২১

[৪০] বর্তমান সময়ের প্রচলিত কওমী মাদ্রাসার শিক্ষানীতি।

করছে। পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশে যারা মানুষকে 'বায়'আত' করায় তাদের প্রতি আমরা বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ট নই। আর যারা দুনিয়ার স্বার্থে ইল্‌ম হাসিল করে অথবা মানুষকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে, তাদের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, তাদের প্রতিও আমরা সন্তুষ্ট নই। তারা সবাই দস্যু, দাজ্জাল, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত।[৪১]

এরপর শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির প্রতি নির্দেশনা দিয়ে বলেন, "নিজেদেরকে ওলামা (শিক্ষিত) আখ্যাদানকারী জ্ঞানার্জনকারীদের বলি: "নির্বোধের দল, তোমরা গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানতিক-বালাগত তথা তর্কশাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্রের গোলক ধাঁধাঁয় আটকে পড়েছো। আর ধরে নিয়েছো যে, জ্ঞান কেবল এগুলোতেই আছে। অথচ সত্যিকার বিদ্যা আল্লাহর কিতাবের সুস্পষ্ট আয়াতে এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে প্রমাণিত সুন্নাতের মধ্যে নিহিত। তোমরা পূর্ববর্তী ফকীহগণের খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বর্ণনাবলীতে ডুবে গিয়েছো। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যা বলেছেন সেটিই একমাত্র হুকুম। তোমাদের বেশিরভাগ লোকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, নবীর কোন হাদীস যখন তাদের নিকট পৌঁছে তখন তারা তার উপর আমল করে না।"[৪২]

অত:পর তিনি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে লেখেন, কুরআন -হাদীসের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে যা তুলে ধরেছেন তা সম্পর্কে লেখেন, ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের উপরই জাতির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এ জন্য তিনি এ দিকে বিশেষ মনোযোগ দান করেন এবং তদানীন্তন রাষ্ট্রভাষা ফার্সীতে কুরআন মাজীদ ও 'মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক'- এর তরজমা করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে উর্দুর প্রচলন হলে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয, শাহ্ রফিউদ্দিন এবং শাহ্ আবদুল কাদির উর্দু ভাষায় কুরআন মাজীদের তরজমা ও তফসীর করেন।

কুরআন মাজীদ অধ্যয়নের পর যাতে হাদীসের জ্ঞান লাভ করা যায় তিনি তদ্রুপ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। একমাত্র শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এবং তাঁর পুত্র ও তাঁদের শাগরিদদের প্রচেষ্টায়ই উপমহাদেশে 'ইলমে হাদীসের ব্যাপক প্রসার ঘটে।[৪৩]

---

[৪১] দার্শনিক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা, পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৬-৩৭

[৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

তারপর শাসকদের প্রতি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা লেখক তুলে ধরেন, "- তোমরা আরাম আয়েশে লিপ্ত হয়ে সাধারণ গণমানুষকে পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হবার সুযোগ দিচ্ছো। প্রকাশ্যে শরাব পান চলছে অথচ তোমরা বাঁধা দিচ্ছো না। প্রকাশ্যে ব্যভিচার, জুয়া ও শরাবের আড্ডা চালু হচ্ছে অথচ তোমরা এগুলো বন্ধ করো না। এ বিরাট দেশে কাউকে শরীয়তের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়নি। তোমরা যাকে দূর্বল মনে করো তাকে খেয়ে ফেলো, যাকে শক্তিশালী মনে করো, তাকে ছেড়ে দাও। নানা রকম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, স্ত্রীদের মান অভিমান এবং গৃহ-বস্ত্রের বিলাসিতার মধ্যেই তোমরা ডুবে গিয়েছো। একবার আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আমীর-ওমরাহ্রা নিজেদের কর্তব্য সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছো। যাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তোমরা সেই জনগণের অবস্থার প্রতি মোটেই দৃষ্টি দিচ্ছো না। দায়িত্বহীনতার ফলে (সমাজের) এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর উপর বেপরোয়া জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে।"[৪৪]

অতঃপর তিনি শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের নৈতিক অবস্থার সমালোচনা করে দেহলভী (রহ.) বক্তব্য তুলে ধরেন। "বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী তোমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রতিপালক থেকে গাফিল এবং এ সঙ্গে শিরকে লিপ্ত রয়েছো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল সে নিজের খানাপিনা ও পরিচ্ছদে বেশী খরচ করে। ব্যয় অনুপাতে আয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় অপরের অধিকার নষ্ট করে।"[৪৫]

আলিম সমাজের প্রতি উদ্দেশ্য করে দেহলভী (রহ.) এর সতর্কবাণী লেখক তুলে ধরেছেন, "তোমরা আল্লাহর বান্দাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছো। তোমরা ব্যাপকতার জন্যে আদিষ্ট-সংকীর্ণতার জন্য নয়।"[৪৬]

এভাবে তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কশূণ্য বহু রীতি-নীতিরও কঠোর সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে মনষ্কামনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যারা পরলোকগত বুযুর্গের দরবারে গিয়ে তার নিকট কিছু চায়, তারা ব্যাভিচারের চাইতে বড় অপরাধে অপরাধী বলে

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

উল্লেখ করেছেন। এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি কত গভীরভাবে মুসলমানদের অতীত ও বর্তমানকে পর্যালোচনা করেছেন।

অতঃপর লেখক ইজতিহাদ এর গুরুত্ব সম্পর্কে দেহলভী (রহ.) দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন, 'মুসাফফা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন: "ইজতিহাদ প্রতিযুগে 'ফরযে কিফায়া'। এখানে ইজতিহাদ অর্থ হলো শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানার্জন এবং সেগুলোর বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা অনুধাবন করে শরীয়তের আইন-কানুনকে যথাযথভাবে সংযোজন ও সংগঠন করা, তা কোন বিশেষ মাযহাব প্রণেতার অনুসারীও হতে পারে।

এ পর্যায়ে লেখক দেহলভী (রহ.) তার গ্রন্থাবলীকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে কুরআন সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভূক্ত। এ ক্ষেত্রে তাঁর লিখিত কুরআন মাজীদের তরজমা 'ফতহুর রহমান' উল্লেখযোগ্য। এটি কুরআনের সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ তরজমা। তাঁর এ পর্যায়ে গ্রন্থের মধ্যে 'মুকাদ্দামা ফী তারজুমাতিল কুরআন', 'আল ফওযুল কবীর' এবং 'আল ফাতহুল কাবীর'ও রয়েছে। এগুলোতে কুরআনের তরজমা ও ব্যাখ্যার মূলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাবলী হাদীস সংক্রান্ত। এর মধ্যে ইমাম মালিকের বিশ্ববিখ্যাত মুয়াত্তার আরবী শরাহ মুসাওয়া ও 'মুসাফ্ফা' প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে হচ্ছে ফিকাহ শাস্ত্র। এর মধ্যে রয়েছে (ক) 'আল ইনসাফ', (খ) ইকদুলজীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত্তাকলীদ। এসব গ্রন্থের মধ্যে তিনি ফকীহদের ইখতেলাফকে বিরোধিতা নয় বরং মতদ্বৈধতারূপে দেখিয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থাবলী হচ্ছে তাসাউফ সংক্রান্ত। এর মধ্যে রয়েছে (ক) ফায়সালাতু ওয়াহ্দাতিল ওয়াজুদ ওয়াশ শাহুদ, (খ) আল কওলুল জামীল, (গ) তাফহীমাতে-ইলাহিয়া ও (ঘ) লুময়াত বিখ্যাত।

পঞ্চম শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে: 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'। তাঁর এ বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটিকে ইসলামের ভাষ্য বলা চলে। মওলানা মানাজির আহ্সান গিলানীর ভাষায় 'আমি এ গ্রন্থটির ন্যায় মানব রচিত এমন কোন গ্রন্থ দেখিনি, যাতে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান হিসেবে সুসংবদ্ধভাবে তুলে ধরা হয়েছে।'[৪৭] বইটির শেষের দিকে লেখক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহ.)

[৪৭] দার্শনিক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা, পৃষ্ঠা: ৫৩

সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.) এর শিক্ষার মূলনীতি সম্পর্কে বলেন-

ভাবী ইসলামী রেনেসাঁর এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মূলনীতি হিসাবে যে সব বিষয় গৃহীত হলো, তা হচ্ছে- (১) কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার ব্যাপক প্রসার দেওয়া এবং ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারাকে মন-মগজ দিয়ে উপলব্ধি করা। (২) আল্লাহ ভীতি ও আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা সৃষ্টি করা, (৩) রাজতন্ত্র ও সরকার তোষণ মনোভাব মন-মস্তিষ্ক থেকে দূর করা এবং ইসলামী বিপ্লবকে পরিপূর্ণ জয়যুক্ত করার জন্য মানুষের মধ্যে ত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করা, (৪) সমাজসেবা ও দুস্থ মানবতার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করা, (৫) রাজকীয় বিলাসিতা পরিহার করে সহজ-সরল জীবনযাপন করা, (৬) ত্যাগী ভাবধারা সৃষ্টি করা এবং যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতার অনুশীলন করা, (৭) সমাজ বিধ্বংসী সকল প্রকার অনাচার, কুসংস্কার ও রীতিনীতি উৎখাতের চেষ্টা করা এবং বিলাসিতার আখড়াসমূহের অবসান করা যা সমাজকে আরামপ্রিয় ও দূর্বল করে তোলে। এছাড়া শাহ্ আবদুল আযীয (রহ.) রীতিমতো সপ্তাহে দু'বার ইসলামী আদর্শ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জটিল জটিল সমস্যাবলী নিয়ে সাধারণ সভায় বক্তৃতা করতেন।

বইটির বৈশিষ্ট্যঃ

১. বইটি আকারে ছোট।

২. পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৩২টি।

৩. এতে দু'টি জীবনী উল্লেখ আছে।

৪. এর ভাষা প্রাঞ্জল।

৫. বইটির প্রচ্ছদ খুবই আকর্ষনীয় ও যথাযথ।

৬. বইটির কাগজের মান খুব ভাল না।

সবশেষে আমরা বলবো, লেখকের এ বইটি আকারে ছোট হলেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রহ.) উপমহাদেশে ইসলামের যে মূল আদর্শকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন তা পেশ করতে

তিনি সক্ষম হয়েছেন এবং এক্ষেত্রে শতভাগ সফলতা অর্জন করেছেন। লেখকের এ বইটিতে সংশিষ্ট বিষয়ে তার অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মেলে।

❖ শহীদে কারবালা

প্রকাশক: প্রকাশ বিচিত্রা, ১২, প্যারিদাস রোড, ঢাকা

প্রকাশকাল: এপ্রিল, ১৯৭৬

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮০

বিশিষ্ট কলমযোদ্ধা মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী যে বিষয়ে কলম ধরেছেন সে বিষয়টিকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে জাতির কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর লিখিত বই "শহীদে কারাবালা" গ্রন্থটি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ । এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লেখার শুরুতে লেখক ইমাম হোসেন (রা.) এর সংগ্রামী জীবনের সত্যের অভিব্যক্তি এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী তুলে ধরেছেন।

তিনিই প্রথম ত্যাগী পুরুষ, যিনি মানুষের জন্য নির্ধারিত ইসলামের হৃত গণতান্ত্রিক অধিকার পুণরুদ্ধারের জন্যে এবং আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার প্রাণসত্তা অবিকৃত রাখার উদ্দেশ্যে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। সত্যের ঝাণ্ডাকে উঁচু রাখার সংগ্রামে শত্রু শক্তির বিপুল সংখ্যাধিক্য, হামলার প্রচণ্ডতা ও নির্মমতা তাঁকে এতটুকু নত করতে পারেনি। নিজের এবং প্রাণপ্রিয় মাসুম সন্তানদের বুকের রক্ত দিয়ে তিনি একথা প্রমাণ করে গেছেন যে, আল্লাহর দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে কোনো মুসলমানের পক্ষে নিজের এবং নিজ প্রাণপ্রিয় সন্ত ানদের জীবনাহুতি দেওয়ার বিষয়টি অতি তুচ্ছ। কেননা, এরই মাধ্যমে প্রমাণিত হয় খোদা প্রীতির প্রকৃত স্বরূপ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলামের চিরন্তন নীতি হক কথা না বলে সুযোগ সন্ধানীর ভূমিকা অবলম্বন করা হলে, ভবিষ্যতে ইসলামের দুর্যোগ মুহূর্তগুলোতে এর আওয়াজকে বুলন্দ করার মতো নির্ভীক মুজাহিদের অভাব ঘটবে। স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সত্যের পতাকা নিয়ে রুখে না দাঁড়ালে, অনাগত দিনগুলোতে অত্যাচারীর সামনে হক কথা উচ্চারণকারীরা কোনো আদর্শ ও প্রেরণা খুঁজে পাবে না। অন্যথায় একটি প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রবল ও জনবল শূণ্য অবস্থায় কথা বলার পরিণতি কি হতে পারে, সংগ্রামী ইমাম হোসাইন ভাল করেই জানতেন।

এরপর লেখক বলেন, হোসাইন এবং তাঁর ভাইয়ের শিক্ষা-দীক্ষার কথা বলতে গেলে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা যে মহান শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ধর্ম, নৈতিকতা এবং রাজনীতি শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যে ধরণের শিক্ষা অনুশীলন পরিবেশে দিবারাত্র লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছেন, দুনিয়ার ইতিহাসে তার অপর কোনো নজির নেই এবং হবেও না। হযরত হোসাইনের শিক্ষক আলী (রা.) হচ্ছেন বিশ্ব মানবের শিক্ষাগুরুর প্রধান ছাত্র। মাতা ফাতেমা ও অন্যতমা নানী আয়েশা (রা.) উক্ত গুরুর প্রধান ছাত্রীদ্বয়। সহপাঠিগণ দুনিয়ার সকল সহপাঠির চাইতে শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান, সুহৃদয়, খোদাভীরু এবং স্নেহবাৎসল্যে পরিপূর্ণ আদর্শবান সহচর।

এরপর মাওলানা কিসমতী তার এই বইয়ে কারবানা প্রান্তেরের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- হোসাইন ত্যাগ সংগ্রামের পথ বেছে নিলেন।

আমীরে মোয়াবিয়ার জীবদ্দশাতেই হযরত ইমাম হাসান নানান ষড়যন্ত্রের কবলে পতিত হয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন। ইমাম হোসাইনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসানের ইন্তেকালের পর মোয়াবিয়া রাজত্বের আট নয় বছর অতীত হয়ে গেছে। মুসলিম জাহানের চতুর্দিকে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। প্রতিকারের শক্তি কারুরই নেই। মুসলিম জনগণের দুঃখজনক পরিস্থিতি সহৃদয় হোসাইনকে পীড়া দিত। কিন্তু এর প্রতিকার তাঁর ক্ষমতার বাইরে। মদীনাবাসীদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হবার পর তারা এখন শুধু হোসাইনের তত্ত্বাবধানে দ্বীনী চর্চা তথা কোরআন ও সুন্নাহর আলোচনায় পূর্ণ দৃষ্টি দেন। এইভাবে তিনি জনগণের মধ্যে সটিক ইসলামী মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার কাজ করেন।

অতঃপর আমীর মোয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর তার নির্দেশ মোতাবেক ৬১ হিঃ মোতাবেক ৬৮০ খৃঃ ইয়াজিদ শাসন ক্ষমতায় বসেই মদীনা অঞ্চলের বিদ্রোহী প্রধান নেতাদের নিকট হতে বশ্যতা আদায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ইয়াজিদের ঔদ্ধত্য হোসাইনকে স্থির থাকতে দিল না। মুসলিম জনগণ ও ইয়াজিদের শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তিতে বিচলিত হয়ে উঠলো। ইমাম হাসান যখন মোয়াবিয়ার অনুকূলে খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করেন তখন ইসলাম বাহ্যত এতটা বিপন্ন হবার আশংকা না থাকলেও এখন অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে।

এই সংকট মুহূর্তে এজিদের বশ্যতা স্বীকার দ্বারা নিজের নিরাপত্তা চাইলে ইসলামের আদর্শকে বিসর্জন দিতে হয় আর ইসলামের কল্যাণ চাইলে ইয়াজিদেরশাসনকে অস্বীকার করতে হয়। ইমাম হোসাইন এই উভয় সংকটে পড়ে শেষোক্ত ত্যাগের পথই বেছে নিলেন। আর এরই শেষ পরিণতি হিসাবে (৬১

হিঃ ১০ মুহাররাম মোতা, ৬৮০ খৃঃ) কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়। অন্যথায় শুধু ইসলামই আপন সত্তা হারাতো না, নবী বংশসহ দুনিয়ার সকল মুসলমান কলঙ্কিত হতো এবং শাহাদাতে কারবালার প্রেরণা নিয়ে যুগে যুগে যেসব ইসলামী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে, তাও হতো কিনা সন্দেহ।

ইমাম হোসাইনের দুরদর্শিতা সম্পর্কে লেখক বলেন, ইমাম হোসাইন তাঁর দুরদৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইয়াজিদ যেভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় এসেছেন, তার পরিচালিত পদ্ধতিতে খেলাফত স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তাতে গণতান্ত্রিক ইসলামী সমাজ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে এবং সমাজ ব্যবস্থায় ও তার প্রাণশক্তিতে দেখা দিবে মূল আদর্শের বিরাট পরিবর্তন ও বিকৃতি। মহানবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের আপ্রাণ চেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করবে রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরাতান্ত্রিক স্বার্থপরতা এবং দেখা দিবে মানুষে মানুষে অসাম্য ও ভেদনীতি। বস্তুতঃ মহাত্মা ইমাম যা আশঙ্কা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাই ঘটেছিল এবং এখনও তার জের চলছে। তাঁর আশঙ্কা সমূহ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল, তার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হলো।

আল্লাহর রবুবিয়্যাত ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবেন আল্লাহ। জনগণ তার প্রজা। এই প্রজা পালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে আলাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালকের কর্তব্য হবে নিজেরা আল্লাহর বিধানের পূর্ণ অনুসারী হবেন এবং জনজীবনকে সেই বিধান অনুসারে গড়ে তোলার সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন; কিন্তু ইয়াজিদের হাতে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ায় দেখা গেল মুসলিম সমাজে মানুষের কর্তৃত্ব ভিত্তিক রাজতন্ত্রের সূচনা হয়েছে এবং রাজতন্ত্রের চিরাচরিত ত্রুটি এবং স্বেচ্ছাচারী নীতিই তাতে অনুসৃত হয়েছে। ইসলামী আইন চালু থাকলেও বাদশা এবং তাঁর পরিবার ও কর্মচারীরা রইলেন এর হাত থেকে মুক্ত।

ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য

ইসলামী রাষ্ট্রের মানেই হলো জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র, যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত ইনসাফপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। সরকার সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের উচ্ছেদ সাধন করবে। কিন্তু পরিবর্তিত ব্যবস্থাধীনে দেখা গেল, রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের উপর শাসকের অপরিসীম কর্তৃত্ব। কর ধার্য এবং তা উসুল করে দেওয়া ও কর্তৃপক্ষের বিলাসী জীবনযাপন ছাড়া রাষ্ট্রের উন্নতি তথা জনকল্যাণ সাধনের কোন নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দেশ্যই আর রইল না।

ইসলামী রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি

তাকওয়া বা খোদাভীতি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি। আর রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যেই হবে প্রথমে তার চরম অভিব্যক্তি। ইসলামের স্বর্ণযুগে সকল কর্মচারী তথা গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র এই প্রাণশক্তি খোদাভীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু ইয়াজিদের হাতে ক্ষমতা আসার পর তাঁর পিতা আমীর মোয়াবিয়ার আমল অপেক্ষা রাষ্ট্র অধিকতর রাজতন্ত্রের রূপ নিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রোম, পারস্য ও অন্যান্য সম্রাটের রীতি-নীতি চালচলন অনুসৃত হতে থাকলো। ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম নিষ্পেষণ, তাকওয়ার পরিবর্তে খোদবিমুখীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, চরিত্রহীনতা, মদ্যপাণ এবং অন্যান্য অনৈসলামী কাজ ও বিলাসিতা দেখা দিল। এককথায় ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের যে সব মূলনীতি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে আসছিল পরবর্তী আমলে পরিবর্তিত ও ক্রমশঃ বিকৃত হতে হতে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

এরপর মাওলানা কিসমতী ইসলামী গণতন্ত্র থেকে মুসলিম রাজতন্ত্র কিভাবে হলো তা বর্ণনা করেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের গণতান্ত্রিক রূপ হলো মুসলিম জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির ক্ষমতায় সমাসীন হওয়া এবং জনগণের আস্থা লাভে বঞ্চিত হবার পর জবরদস্তি করে গদি আঁকড়িয়ে না থাকা। কিন্তু আমীরে মোয়াবিয়ার ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে সেই রীতির ব্যতিক্রম ঘটার পর মীরাস সূত্রে শাহী তখত দখল করার রীতিই শুরু হলো। তারপর খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন ভিত্তিক সেই খেলাফতের দিকে মুসলিম জাতি আর কখনও প্রত্যাবর্তন করেনি।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি ধারা হলো রাষ্ট্র পরিচালিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে আর পরামর্শদাতাগণ হবেন প্রজ্ঞা, তাকওয়া এবং নির্ভূল ফয়সালার অধিকারী হিসাবে গণসমর্থিত ব্যক্তিবর্গ। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যারা 'মজলিসে শুরা'র (পার্লামেন্টের) সদস্য ছিলেন, তাঁরা দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ছিলেন না বটে, তবে স্পষ্টবাদী, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, খোদাভীরু ও আদর্শবাদী এবং মহৎ চরিত্রের লোক হিসাবে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদা সম্পন্ন লোক ছিলেন। অন্য কথায় প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তারাই পার্লামেন্টর সদস্য নির্বাচিত হতেন। নিজের বা কারুর স্বার্থ সংরক্ষণের মনোভাব বর্জিত এব ব্যক্তি সকল ব্যাপারে মত প্রকাশ করতেন। মহান খলীফাগণ তাঁদের মুখ থেকে হক কথা ছাড়া অন্য কিছু আশা করতেন না। কিতু আমীর মোয়াবিয়ার রাজতান্ত্রিক শাসন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে 'মজলিসে শূরার' প্রাথমিক গণতান্ত্রিক ধারার চির অবসান সাধিত হলো।

বাক স্বাধীনতা ছিল ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি অন্যতম অবদান। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এর অদ্ভূত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইয়াজিদ জনগণের সেই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ কেড়ে নিয়েছিল। অবস্থা এরূপ ছিল যে, মুখ খুললে প্রশংসা করতে হবে নতুবা নীরব থাকতে হবে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহও জনগণের নিকট জওয়াবদেহির অনুভূতি রাষ্ট্রপ্রধানের অবশ্যই থাকতে হবে। ইয়াজিদের রাজতন্ত্রে এই সকল কিছুই পরিত্যক্ত হয়। জনগণের অভাব অভিযোগ জ্ঞাত হবার উদ্দেশ্য তাদের সংস্পর্শে আসার কোনোই প্রয়োজন অনুভব করা হতো না।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বায়তুলমাল। সাহাবায়ে কেরাম এর একটি পয়সাও খেয়ানত করতেন না বা অন্যায়ভাবে খরচ করতেন না, কিন্তু সেই বায়তুলমাল ইয়াজিদের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এর আয়-ব্যয়ের কোন হিসাবই কাউকে দেখাবার প্রয়োজন বোধ করতেন না।

সর্বসাধারণ কথাটি উঠে গেল। কারও মতের কোন তোয়াক্কা করা হতো না। খোদা ভীরু ফকীহগণ এ ব্যবস্থাধীনে বিচারকের পদ গ্রহণ না করায় তাদেরকে বেত্রাঘাত খেতে হয়েছে।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের দৃষ্টিতে ভাষা-বর্ণ-গোত্র-অঞ্চল নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদার কোনো তারতম্য থাকতে পারবে না। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাক-ইসলামী যুগের যাবতীয় ভেদ-বৈষম্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

আরব-অনারব বিদ্বেষের সূত্রপাতও তখন থেকেই শুরু হলো। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে অভূতপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল, তা আবার পূর্বরূপ পরিগ্রহ করতে লাগলো।

তিনি বইটিতে শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা সম্পর্কে আলোপাত করেছেন। শহীদে কারবালা ইসলামের এই দুর্দশা ও তার পরিণতি চিন্তা করে সব অনাচারের প্রতিরোধের জন্য কুফার পথে চলেছিলেন এবং কারবালায় গিয়ে ইয়াজিদের সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। একটি সুসংগবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতার ভয়ঙ্কর পরিণতি কি হতে পারে তিনি তা ভাল করেই জানতেন। তাই শত প্রস্তাব ও প্রলোভনেও তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে ইয়াজিদের রাজতন্ত্রকে মেনে নিতে পারেননি। মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কেরামের আদর্শই ছিল তাঁর কাছে সব চাইতে বড়। তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকল্পে দিনের পর দিন অসহ্য দুঃখ কষ্ট স্বীকার করেছেন। একের পর এক প্রিয়জনের প্রাণ অবশেষে নিজের জীবন পর্যন্ত আহুতি দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানেরই নয় গোটা মানবতার সম্মান রেখে গেছেন। এমনিভাবে শহীদানের প্রতিটি রক্ত কণিকায় রেখে গেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের স্থায়ী অনুপ্রেরণা।

অনাগত ভবিষ্যতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনকল্পে হোসাইন আরাম আয়েশী, বৃত্তিভোগী ও জায়গীরদারীর জীবন বেছে না নিয়ে সেই ইসলামী গণতন্ত্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠার পথেই নির্ভীক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন- রেখে যান মহামানবের মহা জাগরণের স্বাক্ষর। আল্লাহর কর্তৃত্ব ও রাসূলের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মুমিনের সংগ্রাম পথে যে কোন বাধা-বিপত্তিই উপেক্ষণীয়, এটাই কারবালার আসল শিক্ষা। এরপর লেখক কারবালা যুদ্ধের পটভূমি, কারবালা সম্পর্কে হযরতের (সা.) ভবিষ্যৎ বাণী, ইমাম হোসাইনের মক্কা ত্যাগ, হোর কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত, আবদুল্লাহ ইবনে উমাইরের শাহাদাত, হোরের দল ত্যাগ ও শাহাদাত, মুসলিম বিন উছজা, আমর বিন জানাদার শাহাদত, তীরের বৃষ্টিতে নামাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বইটির বৈশিষ্ট্যঃ

১. বইটি মূলতঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে।
২. এতে ইসলামী গণতন্ত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. বইটিতে করুণ কাহিনীর বর্ণনা আছে।
৪. এতে শহীদে কারবালার শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
৫. বইটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে।
৬. বইটির ভাষা সহজ ও সাবলীল।

❖ আল কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজসেবা

প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল: প্রথম, ১৯৬৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১

"আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজসেবা" বইটি মূলত একটি প্রবন্ধের পুস্তিকারুপ। এটি ১৯৬৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে তা পুনঃ মুদ্রণ করে। এ বইটিতে লেখক সর্বহারা, দুস্থ মানুষের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা, রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করা, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা, নিকটাত্মীয়, পাড়া প্রতিবেশীর দুঃখ-দুর্দশা মোচনে এগিয়ে আসা, অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রাপ্তিতে সহায়তাদান ইত্যাদি বিষয়ও যে ইবাদতের অঙ্গ এবং এসব জনকল্যাণমূলক কাজের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে তাগিদ রয়েছে সে বিষয়ে আলোকপত করেছেন।

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজসেবা

মানবজাতির পথের দিশারী পবিত্র কুরআনে সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ বিধানকল্পে সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণকে প্রায় উদাসীন দেখা যায়। এমনকি উলামায়ে কিরামের কাউকেও এমন দেখা যায় যে, তাঁরা শরীয়তের অন্যান্য অনুশাসনের ব্যাপারে যে পরিমাণ জোর দিয়ে থাকেন, এ বিষয়টির প্রতি তত জোর দেন না।

মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা। তাই তাদের মহত্ত্ব ও মর্যাদার প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের পদমর্যাদা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গোটা সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষকেই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিরূপে উল্লেখ করেছেন। যেমন বলা হয়েছে: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা, যিনি পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলোকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহর হুকুমে সেগুলোর মধ্য দিয়ে নৌযান চালিয়ে যেতে পারে। আর আল্লাহর 'ফজল' তথা জীবিকা অন্বেষণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমনাগমন করতে পারে। (তাঁর এই অনুগ্রহের কথা চিন্তা করে) আশা করা যায় তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে।' (এছাড়াও) আসমান-জমিনে যত কিছু তাঁর সৃষ্ট বস্তু রয়েছে, সেগুলোকেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তোমাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এসব (আলোচ্য) বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য (মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা চিন্তা করার জন্য) স্পষ্ট নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রয়েছে।"[৪৮]বলা হয়েছে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"ওহে, মানবমণ্ডলী! জেনে রেখো, আমি তোমাদের সকলকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। বিভিন্ন গোত্র, বংশ, বর্ণ ও ভৌগোলিক) জাতিভেদ তো শুধু তোমাদের পরস্পরের পরিচয়ের জন্যে। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি অতি সম্মানিত মর্যাদার পাত্র, যে আল্লাহর হুকুম পালনের ব্যাপারে অধিক সতর্ক।"[৪৯]

কুরআন মজীদে আল্লাহর ইবাদত, তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের ব্যাপারে যত তাগিদ দেয়া হয়েছে, মানব-সেবার প্রতিও অনুরূপ তাগিদ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে মানব-সেবা ব্যতিরেকে স্রষ্টার ইবাদত অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ.

[৪৮] সূরা জাসিয়া, আয়াত- ১২, ১৩

[৪৯] আল-হুজরাত, আয়াত- ১৩

فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

"(হে পাঠক!) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ, যে প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে? (যদি না দেখে থাক তা হলে তার পরিচয় জেনে নাও) সে ব্যক্তি হলো, যে এতিমকে গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় (অর্থাৎ কষ্ট দেয়), সর্বহারা- গরীব মানুষের খাদ্য যোগানোর ব্যাপারে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে না। [এটা নামাযের ও কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি না করার ফল।] এ ধরণের নামাযীদের জন্যে বিরাট শাস্তি, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফিলতি দেখায়, যারা রিয়াকারীর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে এবং যারা (যাকাত কিংবা) প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মানুষকে দিতে অস্বীকার করে।"[৫০]

সুতরাং এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে যদি আ'বেদের মধ্যে মানব সেবার ভাব জাগরুক না হয়, তা হলে এরূপ ইবাদতের তেমন গুরুত্ব নেই।

আসলে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ধন-সম্পদ কেবল ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশে ব্যয় করার জন্যেই দেন নি, বরং বঞ্চিত, উপার্জন-অক্ষম অসহায় মানুষের সাহায্য দানের উদ্দেশ্যও তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। বিত্তবানদের সম্পদে সর্বহারা অসহায় মানুষেরও অধিকার রয়েছে। যারা দ্বীনের কাজের নিয়োজিত রয়েছেন এবং কঠোর দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়েও মানুষের নিকট নিজের কাতরতার কথা প্রকাশ করতে পারছেন না। দানের প্রতিদান হিসেবে মানুষের নিকট থেকে মর্যাদা লাভ বা অন্য কোন সুযোগ প্রাপ্তির আশা করা উচিত নয়। দান একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই হতে হবে। কুরআন মজীদ আদর্শ দানশীলদের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে বলছে: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

"তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানকল্পেই গরীব-দুঃখী, এতিম ও কয়েদীদের আহার দান করে থাকে। (আর বলে), আমরা তোমাদের নিকট থেকে তার কোন রূপ বদলাই প্রত্যাশা করি না।"[৫১]

সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনকল্পে যাকাত একটি কার্যকর বিধান। ইসলাম অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গে যাকাতের কয়েকটি স্তর ঠিক করেছে। (১) যে সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তার মধ্যেই যাকাত ফরয হয়;

[৫০] সূরা মাউন, আয়াত- ১-৭

[৫১] সূরা দাহার, আয়াত- ৮-৯

যেমন- বংশবৃদ্ধিকারী গবাদি পশু, ফসল এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত সম্পদ। (২) শরীয়তের দৃষ্টিতে যে বিত্তবান বলে প্রমাণিত। এ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য হলো, যারা স্বর্ণ-রৌপ্যের অধিকারী তাদের যাকাত দিতে হবে।

যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে এরশাদ হচ্ছে:

"এসব সদকা একমাত্র পাবে ফকীর, মিসকীন এবং যে সব কর্মচারী এসব আদায়ের ব্যাপারে নিযুক্ত থাকবে, আর ঐ সকল ব্যক্তি (ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে) যাদের অন্তর জয় করাকে সংশ্লিষ্ট নিষ্ঠাবান কর্তৃপক্ষ বিবেচ্য মনে করবেন। এছাড়া দাস-দাসীদের মুক্ত করার জন্যে এবং কর্জদারের কর্জ পরিশোধের জন্যে, আল্লাহররাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং অভাবগ্রস্ত প্রবাসী মুসাফিরদের উদ্দেশ্যে এসব বিধান আল্লাহনির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মহাবিজ্ঞ এবং মহা বিজ্ঞানময়।[৫২]

বইটির বৈশিষ্ট্য:

১. বইটি মূলত কুরআনের আয়াত ভিত্তিক লেখা।
২. এতে বিভিন্ন সামাজিক কাজকে মানবসেবা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. এ বইটি আকারে অনেক ছোট।
৪. এতে মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

❖ ইসলামী রাষ্ট্র আন্দোলনের বীর সেনানী আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী

প্রকাশক: আল আশরাফ পাবলিকেশন্স, নাজিরা বাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ১৯৭৬।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৪

এ বইটি মূলত বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত মনীষী আলামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী জীবনীভিত্তিক বই। এ বইতে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী আল্লামা শাব্বীর আহমদ এর

[৫২] সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০

জীবনী এবং অবিভক্ত ভারতে আযাদী আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনে তার ভূমিকা তুলে ধরেছেন। লেখক বইটির শুরুতে লেখকের জীবনী উল্লেখ করে বলেন, আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা ও আন্দোলনের কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের অধ্যক্ষ ছিলেন।

লেখক এ বইতে শাব্বীর আহমদ ওসমানীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, খেলাফত আন্দোলনের সময় জমীয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৩] আলামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী ১৯১৯ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এর কর্ম পরিষদের সদস্য ছিলেন। সে সময় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও মুসলমানরা সভায় পরস্পর বক্তৃতা দিতেন। কংগ্রেসীদের মুখে তখন "হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই" এর শ্লোগান ছিল। আল্লামা ওসমানী হিন্দু-মুসলিম যুক্ত অধিবেশনে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে জোরালো বক্তৃতা দিতেন।

১৯৪৫ সালের অক্টোবরে কলকাতায় মুহাম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেমদের মধ্যে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহিম শিয়ালকোটী, আবুল বারাকাত, মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী, মাওলানা আজাদ সোবহানী, মাওলানা তাহের কালেমী ও আলীগড় মসজিদের খতীব মাওলানা গোলাম মোরশেদের উপস্থিতিতে আল্লামা শাব্বীর আহম্মদ ওসমানীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়।

এরপর লেখক মুসলিম লীগের প্রতি মাওলানার সমর্থন, ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্য আদর্শ প্রস্তাব, ঢাকার আল্লামা ওসমানীর ঐতিহাসিক ভাষণ, স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ওলামা ও পীর মাশায়েখের অতুলনীয় অবদান, আজাদী উত্তর সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও আলেমদের দৃঢ়তা, বিশ্ব মুসলিমের প্রসঙ্গ, মুসলমানদের জয় পরাজয়ের মানদণ্ড, আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্য কখন আসে, মুসলমানদের বিজয় ও তাৎপর্য এবং মুক্তির একই পথ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। বিশ্ব মানব ইসলামের দিকে ফিরে আসবে, কোরআনের আইন ও ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর, ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ার অজুহাত, ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া ওলামা এবং বিভিন্ন ইসলামী দলের মধ্যে মতানৈক্যের অজুহাত, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, কম্যুনিজমের বন্যাকে শুধু ইসলামী শাসনই প্রতিহত করতে পারে, কাশ্মীর সমস্যা ও সফলতা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

[৫৩] জমীয়তে ওলামায়ে হিন্দু প্রতিষ্ঠিত হয়, ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯১৯।

বইটির শেষ দিকে লেখক আলেম সমাজ ও যুব সমাজের প্রতি মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী যে আহ্বান করেছেন তা তুলে ধরেছেন ।

❖ বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ

প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ।

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ- মে, ১৯৮৮; দ্বিতীয় প্রকাশ- মার্চ, ২০০৫ ।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৬৪

বিশিষ্ট লেখক ও আলেম মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর লেখা বড় বইগুলোর মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য বই । যে সব আলেম ও পীর মাশায়েখ এদেশে জন্ম নিয়েছেন বা বর্হিদেশ থেকে এসে ইসলাম ও মুসলিম জনগণের সেবা করেছেন, এ দেশবাসীর ঈমান আকীদা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন, বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলায় বুকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করে গেছেন । তাঁদের কথা এখন আমরা আর স্মরণ করিনা । কিন্তু মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সমসাময়িক কয়েকজন আলেম ও পীর মাশায়েখের সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেছেন । মাওলানা কিসমতী তার ৩৬৪ পৃষ্ঠার এই বইটি ২টি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন । প্রথম খণ্ডে তিনি নিম্নোক্ত ১২ জন বিখ্যাত আলেমের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন ।

১. মাওলানা হাজী শরীয়তুলাহ (রহ.)

২. পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিঞা

৩. পীর বাদশাহ্ মিঞা

৪. মাওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী

৫. মাওলানা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর

৬. মুনশী মেহেরুল্লাহ

৭. ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীক (রহ.)

৮. মাওলানা রুহুল আমীন

৯. মাওলানা নিসারউদ্দীন আহমদ

১০.মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ

১১.মাওলানা আব্দুল্লাহীল বাকী

১২.মাওলানা আব্দুল্লাহীল কাফী

এরপর মাওলানা কিসমতী তার বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নোক্ত ষোল জন বিখ্যাত আলেমের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন-

১. শহীদ মাহমুদ মোস্তফা আলমাদানী

২. জ্ঞান তাপস মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহ.)

৩. সূফী রাজনীতিজ্ঞ মাওলানা আতহার আলী

৪. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

৫. মুফতী দীন মুহাম্মদ খাঁ

৬. মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান

৭. মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী

৮. মাওলানা ওবায়দুল হক ইসলামবাদী

৯. মাওলানা আবদুল মজিদ খাঁ

১০.মাওলানা আবদুল আলী ফরিদপুরী

১১.মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

১২.খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ

১৩.মাওলানা শেখ মোখলেসুর রহমান

১৪.সংগ্রামী সাধক পীর মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)

১৫.ফখরে বাঙ্গাল মাওলানা তাজুল ইসলাম

১৬.মুফতী-এ-আজম মাওলানা ফয়েজুল্লাহ (রহ.) ।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী অত্যন্ত চমৎকারভাবে তাঁর এই বই এর মধ্যে ২৮ জন আলেম ও পীর মাশায়েখের জীবনী ও তাঁদের অবদান তুলে ধরেছেন।

লেখকের মৌলিক বই "বাংলাদেশে কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ" বইটি সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির মতামত তুলে ধরা হলো।

"আমাদের দেশে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের জীবনী নিয়ে চর্চা করা হয়। দুঃখজনকহলেও সত্য যে, 'আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরাধিকারী' হিসাবে অভিহিত উলামায়ে কেরামের জীবনী তেমনভাবে চর্চা হয় না। অথচ তাঁরা শুধু ইসলামের দায়ী হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেননি। এ দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথী হয়ে তাঁরাও এদেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তাদের খেদমত করেছেন, তাদের এই হিসেবে তাদের নিত্য দিনের অভাব অভিযোগের সহযাত্রী হয়েছেন। তাদের কল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

দীর্ঘ দিনের এ অভাব পূরণে এগিয়ে এসেছেন প্রবীণ সাংবাদিক, লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী। তিনি বাংলাদেশের আটাশ জন আলেমে দীনের জীবন ও কর্ম সাধনা 'বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ' শীর্ষক এ গ্রন্থেই তুলে ধরেছেন।[৫৪] বইটি সম্পর্কে আরেক বিখ্যাত আলেম বলেন, "প্রথম প্রয়াস হিসেবে তাঁর এ লেখা ত্রুটিমুক্ত হয়েছে এ কথা বলতে চাই না। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, এ প্রয়াস প্রশংসনীয় ও সময়ের একটা তীব্র দাবী পূরণের প্রথম সফল প্রচেষ্টা।[৫৫]

বইটির বৈশিষ্ট্যঃ

১. বইটি আকারে বড়।

২. এতে ২৮ জন আলেমের জীবনী আছে।

৩. বইটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত।

৪. বইটি মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৬৪।

৫. বইটি প্রচ্ছদ আকর্ষনীয়।

৬. বইটির পাতার মান উন্নত।

---

[৫৪] মোহাম্মদ আবদুর রব, পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

[৫৫] মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সম্পাদক, মাসিক মদীনা।

এই পর্যায়ে আমরা মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর অনুদিত কয়েকটি বই সম্পর্কে আলোচনা করব, তিনি আরবী ও উর্দু ভাষায়ও দক্ষ ছিলেন।

❖ উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস (আবে কাউসার)

মূল: ড. প্রফেসর শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম

অনুবাদক: মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী

প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০০৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৭০

বইটি মূলত প্রফেসর ড. শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত "আবে কাউসার" এর বাংলা অনুবাদ। মাওলানা কিসমতী কর্তৃক অনুদিত বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মুহাম্মদ মূসা এবং প্রুফ দেখার দায়িত্ব পালন করেন জনাব মনজুরুল করীম চৌধুরী। ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে প্রাচীন ইতিহাস, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা, বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান এবং বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামের আগমন, ইসলামের প্রসার, ঐতিহাসিক বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে লেখক নিম্নোক্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

বইটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে শেখ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম বলেন, "উপমহাদেশকে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। বাগদাদ পতনের পর ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির মূল স্রোতধারা বিভক্ত হলে দিল্লী, কায়রো ও ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত হয়। ১৭৫০ সাল পর্যন্ত এই ধারা উপমহাদেশেই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল। এই প্রেক্ষাপটে উলামায়ে কিরাম ও তাদের ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে একটি ধারণা এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এসব ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের ঐতিহ্যের গৌরবময় দিক। এই ধরণের

গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আমদের জাতীয় চরিত্র ও বংশধরদেরকে ঐতিহ্য-সচেতন করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।"[৫৬]

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী অনুদিত এই বইটিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: আরব ও বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশ

প্রাচীন সম্পর্ক, সিন্ধু বিজয়, মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের শাসন-শৃঙ্খলা, মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের স্থলাভিষিক্ত, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক যোগসূত্র, ধর্মীয় অবস্থা ও শায়েখ আবু তোরাব তাবে তাবেঈ।

ভারতীয় উপকূলে আরবদের বসতি

শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, গুজরাট উপকূল, মালাবার, মেবার, মেবারে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র, পূর্ব-ভারত ও দূরপ্রাচ্যে ইসলামের প্রচার।

দ্বিতীয় অধ্যায়: গজনী ও লাহোর

আমীর নাসীরুদ্দীন সবুক্তগীন, সুলতান মাহমুদ গযনভী, সুলতান মাহমুদের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, মাহমুদের উত্তরাধিকারী মাসউদ, মুহাম্মদ ও বাহরাম, দু'হাজার মুসলিমের লাশ, খসরু শাহ ও বৃহত্তর শাসনের অবসান, শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি, লাহোরে ইবরাহীম গযনভীর শাসন, আলাউদ্দীন মাসউদ গযনভী, গযনভী বংশের শেষ শাসক খসরু মালিক ও গযনভী যুগের আল্লামা আবু রায়হান আলবেরুনী।

উলামা ও মাশায়েখ

শাহ্ ইউসুফ গার্দেজী মুলতানী (রহ.), লাহোরে উলামা-মাশায়েখ, শায়েখ ইসমাঈল লাহোরী, দাতাগঞ্জ বখ্শ লাহোরী, ইমাম হাসান সানআনী লাহোরী (রহ.), সুলতান সখী সরওয়ার (রহ.) ও অন্যান্য কতিপয় বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব।

তৃতীয় অধ্যায়: ব্যাপক প্রচার যুগ: রাজ্য বিস্তার

[৫৬] শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুলতান মুয়িযউদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী, ভারতের উত্তর দ্বার মুসলমানদের জন্যে উন্মুক্ত হলো, দাস বংশ, সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবন ।

দাস বংশের আমলে শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা

কুতুবউদ্দীন আইবেকের সময়কাল, নাসিরউদ্দীন কুবাচার রাজদরবার, ইলতুৎমিশের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, তাজউদ্দীন সঙ্গেরিয়াহ্, আমীর রুহানী, অন্যান্য কয়েকজন কবি, কলমজীবী সুফী সম্প্রদায়, নাসেরী আমলের কলমজীবী, ভারতে ইসলামী আইন বা ফিকহ শাস্ত্রের সূচনা, শায়খ নূরুউদ্দীন মোবারক গযনভী, সদরুস্ সুদূর কাজী মিনহাজ সিরাজ জুরজানী, মাওলানা বুরহানউদ্দীন বলখী, ইলমের বিস্তার, খিলজী বংশ ও সাঈদী মাওলা ।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী

আলাউদ্দীনের স্বভাবে কঠোরতা, আলাউদ্দীন খিলজীর শাসনকালীন অবদান, সম্রাট আলাউদ্দিন এবং আলাউল মূলক-এর মধ্যকার ঐতিহাসিক কথোপকথন, সমকালীন কবিদের দৃষ্টিতে আলাউদ্দীন খিলজী, আলাউদ্দীন খিলজী ও ইসলাম ধর্ম, বাদশাহ ও কাজী মুগীসউদ্দীনের কথোপকথন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাজী শামসুদ্দীনের ভারত সফর, খিলজী বংশের পতন, কুতুবউদ্দীন মোবারক শাহ, আলাউদ্দীনের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, আমীর হাসান সানজারী, ভারতের তোতাপাখি আমীর খসরু, আমীর খসরু ও হযরত সুলতানুল মাশায়েখ, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

ইসলাম প্রচারের বিশেষ উপকরণ, সুফীদের কর্মপদ্ধতি, সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহ), মীর সাইয়েদ হোসাঈন খোঙ্গ সওয়ার, সুফী হামিদউদ্দীন নাগোরী, নন্দর বার অঞ্চল খান্দিশ, খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.) শায়েখে কবীর বাবা ফরীদগঞ্জে শকর (রহ.),

মখদুম আলাউদ্দীন সাবের, সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিযামউদ্দীন মাহবুব ইলাহী, সুলতানুল মাশায়েখ ও সমকালীন বুযুর্গগণ, হযরত সুলতানুল মাশায়েখের মর্তবা, হযরত বু'আলী কলন্দর (রহ.) ।

মুলতানে তাবলীগ ও সুফীবাদের কার্যক্রম

সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য সিলসিলাহ্, সোহরাওয়ার্দীয়া, কাদেরিয়া, নকশেবন্দিয়া, শায়েখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া সোহরাওয়ার্দী (রহ.), শায়েখ সদরউদ্দীন, হযরত শায়খ রুকনউদ্দীন আবুল ফাতাহ, সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার আফগানী মাশায়েখবৃন্দ ।

বঙ্গে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

শেখ জালালউদ্দীন তিবরিজী (রহ.), ভারতবর্ষের আয়না শেখ মি'রাজ (রহ.), শেখ আলাউদ্দীন আতাউল হক বাঙালী লাহোরী (রহ.), হযরত নূর কুতবে আলম (রহ.), শেখ শাহজালাল মোজাররাদ, সিলেটি, শেখ শাহ্ জালালউদ্দীন মোজাররদ স্মরণে, বঙ্গের গাজী আউলিয়া ।

সাইয়েদ নাতহারুলী এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত

দক্ষিণ ভারত, দাক্ষিণাত্যের অপর প্রাচীনতম বুযুর্গ, শায়েখ মুন্তাখাবুদ্দীন (রহ.), পাল্কীর আগমন, বিজয়পুরের ধর্ম প্রচারকবৃন্দ, গুলবার্গা শরীফ, হযরত সাইয়েদ বান্দানাওয়াযে গেসূদারায (রহ.), কাশ্মীর, ইসলাম বিস্তার ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মুসলিম অভ্যুদয় ও প্রসারের যুগ

তোগলক, সাইয়েদ এবং লোদী বংশের শাসনাতল, সুলতান গিয়াসুদ্দীন তোগলক, সুলতান মুহাম্মদ বিন তোগলক, হযরত মাখদুম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ চেরাগ-এ-দেহলভী (রহ.), চেরাগ-এ-দেহলীর ধৈর্য-সবর, সংক্ষিপ্ত অবস্থা, ইসলামের প্রচার, ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিস্তার, শরীয়ত সংরক্ষণ, জীবনাবসান, তোগলক বংশের রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, মুহাম্মদ বিন তোগলকের আমল, জিয়া নাখশাবী, জিয়াউদ্দীন বারনী, ইমামী, ফিরোজ শাহী আমল, ফিকহ শাস্ত্রের উন্নতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য তৎপরতা, আইনু'ল মূলক মুলতানী, তৈমুর, প্রাদেশিক প্রশাসনসমূহ, বঙ্গদেশ, জৌনপুর,

মালদহ, গুজরাট, শেখ আলী মুহায়েমী, দাক্ষিণাত্য, শায়েখ জামালী, ভক্তি আন্দোলন, ইসলাম প্রচার, উপমহাদেশে ইসলামের প্রভাব।

মূলত খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে দিল্লীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরই উপমহাদেশে ইসলামের ভিত্তি মজবুত হয়। এই বিশাল ভূ–খণ্ডে ছড়িয়ে পড়ার জন্য ইসলাম তার একটি শক্তিশালী কেন্দ্র লাভ করে। তার পূর্বে এই কেন্দ্রে যেই মুসলিম রাজশক্তি ছিল, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলিম সেই শক্তি আশানুরূপ বড় ধরনের অবদান না রাখলেও তাদের অনুসৃত নীতি সকল সময় এই উপমতাদেশে ইসলাম প্রচারের সহায়ক ছিল। এই এলাকায় ইসলামী সংস্কৃতি পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল একটি বিশিষ্ট রূপ। তবে ইসলামী সংস্কৃতিতে শক্তিশালী ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে উলামা-মাশায়েখ এবং সুফী-সাধকগণের ভুমিকাই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। উলামা ও সুফীগণ সর্বদা রাজশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্ঠা করেছেন। এই বিষয়টি বইতে তুলে ধরা হয়েছে।

❖ আদর্শ কি ভাবে প্রচার করতে হবে

মূল : আবু সালীম মুহাম্মদ আবদুল হাই
অনুবাদ : জুলফিকার আহমদ কিসমতী
প্রকাশক : আইসিএস প্রকাশনী , ঢাকা
প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪
পরিমার্যিত সংস্করণ : আগষ্ট , ২০০২
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৮

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সম্পাদিত এই বইটিতে ইসলামী আদর্শ কীভাবে প্রচার করলে তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তা ফুঠে উঠেছে। বইটির মূল বক্তব্য হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কথাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। কোনো ব্যক্তি তার নিজের মত ত্যাগ করে আপনার মত গ্রহণ করবে, এমনটা সহজে হয় না। অথচ অপরের কাছে আপনার কথা পৌঁছাতে হবে এবং সেও একে নেবে, একমাত্র এ পথেই ইসলামী বিপ্লব আসে। ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে মানুষকে সর্বাগ্রে ইসলামের দাওয়াত বুঝতে হবে, তার যাবতীয় বিধানকে নিজের জীবনে কার্যকরী করতে হবে এবং নিজের যাবতীয় চিন্তা ও মতবাদ পরিত্যাগ করে ইসলাম প্রদত্ত মতবাদ গ্রহণ করতে হবে, এরই প্রয়োজন

সর্বাধিক। এ উদ্দেশ্যকে কার্যকারী করার চেষ্টা করে যাওয়ার নাম 'তাবলীগ' বা ইসলামী আর্দশের প্রচার।

এ থেকে উপকৃত হবার জন্যে শর্ত হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

(১) যে ব্যক্তি ইসলামী আদর্শের প্রচারকল্পে এ সকল পরামর্শ থেকে উপকৃত হতে ইচ্ছুক, তাকেই সর্বাগ্রে ঈমান এবং ইসলাম সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা রাখতে হবে এবং নিজের মধ্যে সে সমস্ত আকীদা-বিশ্বাসকে যথাযথভাবে কার্যকরী করতে হবে- যা তাওহীদ, আখিরাত এবং রিসালাত সম্পর্কে ইসলাম শিক্ষা দিয়ে থাকে।

(২) জীবনের যে লক্ষ্য ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে তাকে নিজের জীবনে একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে।

(৩) আদর্শ প্রচারকের চরিত্রে এমন কোনো বৈষম্য থাকতে পারবে না যা তার দাবী ও আদর্শের পরিপন্থী।

(৪) যে কোনো কাজ করবে সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করবে এতে অন্য কোনো স্বার্থ নিহিত থাকতে পারবে না।

(৫) ইসলামী আদর্শের এ প্রচারকার্য একটা আন্দোলন হিসেবে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে, কেননা সাময়িক কোনো তৎপরতার দ্বারা কোনো সুষ্ঠু ও স্থায়ী বিপ্লব সাধিত হতে পারেনা।

বইটিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে: মানুষের সাথে সম্পর্ক, নিজেকে সবাই ভালো মনে করে, মনের ঝাল প্রকাশ করা, সমান ব্যবহার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, কথা বলার ধরণ, গুণের সমাদর, জয় পরাজয়ের ভাব, মানসিক প্রবণতার প্রতি সম্মান প্রদর্শক, যেসব ব্যাপারে মতের মিল রয়েছে, পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হোন।

এ বইটির শেষে যা বলা হয়েছে তা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হয়েছে, আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে কোন সময় মানুষের উন্নত সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আবেদনের সাথে সাথে তার বিভিন্ন ভাবাবেগের প্রতিও আবেদন জানাবার চেষ্টা করা উচিত।

❖ সোভিয়েট ইউনিয়নে মুসলমান

মূল: মোহাম্মদ সাফওয়াদ সাকা আমীনী
অনুবাদক: জুলফিকার আহমদ কিসমতী
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৬৬

এই বইটির পেছনে একটি কাহিনী রয়েছে। তা হলো কম্যুনিষ্ট লৌহ-যবনিকা অতিক্রম। সোভিয়েট ইউনিয়নকে লেনিন, স্টালীন এ নামেই আখ্যায়িত করেছিলেন, যেখানে বর্তমানে প্রায় ষাট মিলিয়ন মুসলমান রয়েছে। এ বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠী অন্তরীণাবদ্ধ হয়ে আছে ঐ ভয়ার্ত যবনিকার অন্তরালে। বহির্বিশ্বের সাথে তাদের নেই কোন সম্পর্ক। বৃহত্তর মুসলিম জাতিসত্তা এবং তাদের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতা ও মত বিনিময়েরও কোন অবকাশ নেই। আসলে এটাই বলতে চাচ্ছি যে, ঐ লৌহ প্রাচীরটি অতিক্রম করা এবং এর অভ্যন্তরস্থ দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল মুসলিম দেশসমূহে পৌঁছে স্বাভাবিক কাজ নয়। অথচ, এটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিশেষ করে বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য এবং সকল মুসলিম দেশের সাথে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনকল্পে তাদের সাথে যোগাযোগ অত্যাবশ্যক। সেখানে রয়েছে অনেক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। আমার মতো যাদের ওখানে যাবার সুযোগ ঘটেছে তাদের পক্ষেই কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নে অবস্থানরত মুসলমানদের যথার্থ অবস্থা জানার সুযোগ হতে পারে। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায় বাস্তব অবস্থা। এর মধ্য দিয়ে যেমন সঠিক তথা অবগত হওয়া যায় তেমনি প্রতিটি জিনিস সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায়। কথায় বলে- "নিজ চোখে দেখা আর কানে শোনা এক কথা নয়।"

পুস্তকটি প্রকাশের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়, মক্কাস্থ রাবেতা এ আলমে ইসলামী দফতর এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কাজাকিস্থানে অবস্থিত মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন সম্পর্কে পত্র বিনিময়: সম্মেলনে আলোচনায় বিষয় বস্তু ছিল- "ইমাম বুখারী এবং আধুনিক যুগ: প্রস্তুতি কমিটি গঠন এবং সম্মেলনের এজেন্ডা তৈরী। রাষ্ট্র এবং ধ্বংসাত্মক মতবাদের অনুসারী হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে দুটি মূল্যায়ন: সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ: রাবেতা- এ- আলমে ইসলামী এবং সোডিয়েট ইউনিয়নেয় মুসলমানদের মধ্যে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে পত্র বিনিময়: মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের জন্যে শিক্ষা ভাতা মঞ্জুরীর আবেদন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সংহতিকে সুদৃঢ় করণ।

মস্কোর পথে: মস্কো থেকে সমরকন্দে: ইমাম বুখারী সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশন: সম্মেলনে আরবী ভাষার ব্যবহার: সম্মেলনে আমার ভাষণ: সম্মেলনে রাবেতা-এ-আলমে ইসলামীর অংশ গ্রহণ ও সোভিয়েট মুসলমানদের হৃদয়ে তার প্রভাব: মসজিদ এ-খাজা মুরাদ: সমরকন্দের দারুল উদরা: রুশ মুসলমানদের হৃদয় মক্কার সাথে গাথা: সম্মেলনে রাবেতার অংশ গ্রহণের দরুণ বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের নেতৃবৃন্দের উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা: খাজা আওয়ার মসজিদ: সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন: সমাপ্তি ভাষণের উপর আমাদের মন্তব্য এবং একাত্মতার প্রকাশ: রুশ সাংবাদিকের সাথে আলোচনা: প্রতিনিধি দলসমহের সদস্যদের নাম

সমাপ্তি ভাষণ ও সম্মেলনের সিদ্ধান্তবলী: মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আহ্বান

কম্যুনিজমের আগে পরে সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলমান: অতীত ও সমকালীন ইতিহাস: রুশ শাসন প্রভাবের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলন এবং তার ফলাফল: ১৯৩৭ সালে মুসলিম তাতারী আমীর আলী ওগালীর ফাসিঁ, কয়েক মিলিয়ন মুসলমানকে রাশিয়া থেকে নির্বাসন দান, সোভিয়েট ইউনিয়নের ৩টি ইসলামী ভূখন্ড, বর্তমানে সোভিয়েট মুসলমানদের সংখ্যা, মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস প্রসঙ্গ, নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা, কম্যুনিজম ইহুদীবাদের পোষ্য, একজন মুসলিম যুবক আল-াহকে ভালবাসে তারপর লেনিনকে, সোভিয়েট মুসলমানদের পারস্পরিক সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক, তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, জাকাত সংগ্রহ করে ও ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করে, মুসলমানের প্রকৃত সংখ্যা অজ্ঞাত, নাম, চালচলন: খাওয়া পরার ধরণ, কোরআনের মসহাফে ওসমানীর সংস্করণ, মুসলমানদের কবর, ধর্মীয় শিক্ষা, মাতৃভাষা ও জাতীয় ভষার বিনিময়, ধর্ম বিষয়ক সংগঠন, সোভিয়েট ইউনিয়নে ইসলামী প্রজাতন্ত্র, মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহ, বিভিন্ন ইসলামী সম্মেলন, ধর্মীয় সাহিত্য: আশা-অনুপ্রেরণা, পাসপোর্ট-ভিসার ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম রাজনীতি ।

সম্মেলনে রাবেতা-এ-আলমে ইসলামীর যোগদান এবং আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম, সৌদী রাজনীতি সম্পর্কে সংবাদপত্রের অজ্ঞতা, "রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং দল কম্যুনিষ্ট পার্টি", বাদশাহ্ ফয়সলের রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের দৃষ্টিতে বাদশাহ্ খালেদ ও যুবরাজ ফাহাদ, একটি পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি । রাশিয়া এবং মুসলিম বিশ্ব, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে রাশিয়া পরাভূত করতে পেরেছে কি? সোভিয়েট ইউনিযনের রাষ্ট্রীয় সবিধানে মানবাধিকার, হেলসিংকি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, ইমাম বুখারীর শিক্ষা সাধনার উপর আয়োজিত সম্মেলনের কয়েকটি দৃশ্যের ছবি ।

বইটিতে মূলত সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলমানদের পৃথিবীর অন্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় এবং উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কেমিনিস্তান, তাজাকিস্তান ও কিরগিস্তান এর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায় সে ব্যাপারে মুসলিম নেতাদের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ধ্বংসাত্মক কম্যুনিষ্ট মতবাদের মূলনীতির বিরোধিতা করে বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রধানদের কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়- যাতে করে সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলিমরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও ধর্ম পালন করতে পারে।

বইটির বৈশিষ্ট্যঃ

১. বইটিই প্রথমে বাদশাহ খালেদ বিন আব্দুল আকিজ এর ছবি আছে।

২. বইটির শেষের দিকেও বিখ্যাত কিছু ব্যক্তির বিশেষ মুহুর্তের ছবি আছে।

বিখ্যাত দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশিষ্ট লেখক মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত লেখক ও লেখিকার বই সম্পাদনা ও পরিমার্জিত সম্পাদনা করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি বই সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

❖ শ্রেষ্ঠ নবী (সা.)

লেখক: মুফতী নূরুল ইসলাম

সম্পাদনায়: মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী

প্রকাশক: আল এহসান প্রকাশনী, মিরপুর- ১১, ঢাকা।

প্রকাশকাল: রজব, ১৪২৪ হিঃ

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে প্রথম নবী, প্রথম মুসলমান ও শেষ নবী তা কুরআন-হাদীসের আলোকে এ বইটিতে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও বইটিতে নিম্নোক্ত বিষয়বালী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মহানবী (সা.) হলেন সৃষ্টির সেরা মানব, তিনি বিশ্ব জগতের জন্য রহমত ও নিরাপত্তা স্বরুপ, তাঁর উপর এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনা একই সূত্রে গ্রথিত, তাঁর নামে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা শপথ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কখনোও নামে ধরে ডাকেন নি, তাঁর প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ

সর্বক্ষণ দুরুদ পাঠ করেন, "জাওয়ামিউল কালিম" বৈশিষ্ট্য একমাত্র তাঁরই ছিল, সকল নবী-রাসূলের মুজিজা পেয়েছেন, তাঁর যুগ ছিল মানব জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ যুগ, তিনি দৈহিক সৌন্দর্য ও চারিত্রিক মাধূরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁর কবর খোলা হবে। কিয়ামতের দিন তিনি সকল নবী-রাসূলের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিবেন। তিনি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন, শুধু তাঁর জন্য আরশের ডানপাশে একটি আসন পাতা হবে, আল্লাহ তায়ালা ভালবেসে এই উম্মতের নাম মুসলিম রেখেছেন, এ উম্মতের সকল দূর্ভিক্ষে ধ্বংস হবে না।

সংক্ষিপ্তাকারে হলেও বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতী নূরুল ইসলাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সহজ ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন।

❖ ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের সমস্যাবলী ও মুক্তির পথ

লেখিকা - রহমত বাণু

সম্পাদনায়: মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী

প্রকাশক: আহসান পাবলিকেশন, বাংলা বাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০০৮

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৪০

রহমত বাণু রচিত "ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের সমস্যাবলী ও মুক্তির পথ" শীর্ষক বইটি মাওলানা কিসমতী কর্তৃক সম্পাদিত বই সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম বই। এতে জীবন ঘনিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং সমস্যা সমূহের সুন্দর সমাধান দেয়া হয়েছে। বইটিতে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

আত্মীয়তার সম্মান, পিপীলিকা থেকে শিক্ষা, দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত, ভালোবাসা শিশুদের জন্মগত অধিকার, বিয়ের সময় এক কনের অনুভূতি, ক্ষমা একটি উত্তম কাজ, নারীর দায়িত্ব, দয়াশীলের প্রতি দয়া করা হবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন, দেহ ও আত্মার মিলন, ইসলাম ত্যাগের ধর্ম, যে বারি বিন্দু পরিণত হয় দুর্লভ রত্নে, ফেরেশতাদের সিজদায় ধন্য সে কাঙ্ক্ষিত মানুষ, প্রতিহিংসা এক বিষাক্ত সাপ, ইসলামে নারীর মর্যাদা, জীবনের তিন রূপ, সচ্চরিত্রে ঈমানের পরিপূর্ণতা,

দায়িত্বানুভূতি এবং তাকওয়া, তাওবাতান নাসূহা (বিশুদ্ধ তাওবা), কুরআনের হক, মুসলমান কে? আল্লাহর দৃষ্টিতে হালাল উপার্জন, জীবনের জটিলতা ও মুক্তির পথ, নারী ও পুরুষের পার্থক্য, পোশাকের মর্যাদা, যখন আমরা নতুন ঘর আবাদ করি, রোযা আমাদেরকে প্রবৃত্তি দমন শিক্ষা দেয়, যারা আলাহর রাস্তায় ব্যয় করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন, আমি ওর চেয়ে উত্তম ও রাসূল প্রেম।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাই। আমরা বুঝতে পারি না যে আমাদের করণীয় কী? এই বইটিতে লেখিকা রহমত বাণু পবিত্র কুরআন, হাদীস, নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও যুক্তির মাধ্যমে বাস্তবিক বিষয়গুলো চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, যা মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চা

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চা

ভূমিকা

দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। এ যুগে সংবাদপত্র একদিকে যেমন বিশ্বের বিচিত্র ধরণের ঘটনার খবর পাঠকের কাছে বহন করে আনে, তেমনি একটি স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারেও থাকে এর বিরাট ভূমিকা। জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কিংবা জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনো অশুভ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সমাজের সামগ্রিক চেতনাকে চাঙ্গা করে গণজাগরণের সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর কোন জুড়ি মিলে না। সংবাদপত্র হচ্ছে আজকাল বহুমুখী জ্ঞানের আধার। সংবাদপত্র যেমন দেশকে উঠাতে পারে, তেমনি ডুবাবারও ক্ষমতা তার বিরাট। ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশ ও জাতির ধ্যান-ধারণা সঠিক পথে পরিচালনায় সংবাদপত্রের বিরাট ক্ষমতার প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে এর উপর বিরাট গুরু দায়িত্বও এসে বর্তায়। এ দায়িত্ব পালনে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত যে কোনো ব্যর্থতা দেশ ও জাতির ভাগ্যে ডেকে আনে মস্তবড় বিড়ম্বনা।

জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যেই স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যাবতীয় শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েই অতীতে এ দেশের স্বৈরাচারী কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণবিস্ফোরণ ঘটেছিল। তারই পটভূমিতে অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে এ দেশবাসী লাভ করে স্বাধীনতা।

সাংবাদিকতা কেবল দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনেই ব্যর্থ হয় না বরং জাতির জন্য বহুবিধ অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে যেমন সংবাদপত্রের উপর থেকে জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলে, তেমনি প্রয়োজনে সংবাদপত্রের কোনো মহত্তর ডাকে সাড়া দিতেও তারা ইতস্তত করে । পৃথিবীতে বহু একনায়ক শাসককে নিয়ে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের মানসে এরূপ ভূমিকা পালনের নজির রয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন ইন্দোনেশিয়ার পরলোকগত প্রেসিডেন্ট ডক্টর আহমদ সুকার্নোর বিরাট ছবি সে দেশের এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিন শোভা পেতো এবং

তার যে কোন বক্তব্য পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধান শিরোনামের মর্যাদা পেতো। একদিকে অর্থ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে দেশের বড় বড় প্রকল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় উপকরণাদির অভাবে শিল্প কারখানায় উৎপাদন হ্রাস পেয়ে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে, অফিস-আদালত দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে, অপরদিকে ঐ শ্রেণীর সংবাদপত্র জাতির 'পাপু'র প্রশস্তি গেয়ে 'সব ঠিক হ্যাঁয়' বলে তাকে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখছে। দেশ ও জাতির দরদে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো মহল পরিস্থিতির 'অপর পিঠ' তুলে ধরার জন্যে এগিয়ে এল, তাদেরকে ঐ সকল সংবাদপত্র 'পঞ্চম বাহিনী' এবং 'নেতাকে ক্ষমতাচ্যুতকারী' হিসাবে চিত্রিত করতো আর তাদের প্রতি সরকারি দমন নীতি চালানোর ওকালতি করতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ তোয়াজ-তোষামোদের নীতির পরিণতি কি দাঁড়িয়েছিল? তা বিশ্ববাসীর জানা। তাতে দেশের অগণিত জনতার দুর্ভোগ ও অশান্তিই কেবল বাড়ে না, এরূপ তোষামোদ ও তোয়াজে সাংবাদিকতা প্রত্যেক দেশের সংশ্লিষ্ট শাসককেও ডুবায়। অনেক সময় তাদের নিজেদের ও ডুবতে দেখা যায়। এ দৃশ্য যেমন দেখা গেছে সাবেক পাকিস্তানে আইয়ুবী দশকে, তেমনি দেখা গেছে জামাল নাসেরের শাসনামলে মিসরেও।

বাংলাদেশ গঠিত হবার অব্যবহিত পর আমাদের সাংবাদিকতার ধারা যে খাতে বয়ে চলেছিল, তা সমাজের অনেক বিবেকবান মানুষের দৃষ্টিতেই পীড়াদায়ক ও নৈরাশ্যকর ঠেকে ছিল। কেননা কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ঐ সময় অনেকেই অবাস্তব ও ভিত্তিহীন প্রশংসা ও তোষামোদের ভূমিকা পালন করেছিল। দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, জনগণের অধিকার, তাদের কৃষ্টি ও ন্যায্য দাবী-দাওয়াসমূহের ব্যাপারে সরকারকে সচেতন করার জন্যে স্বল্প সংখ্যক সাংবাদিকদেরই প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। তখন এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর অবদান ছিল সবচাইতে বেশি। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার পরিচয়ও কেউ দেয়নি যে, তা নয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কারও কারও ভূমিকা ছিল নিজেদের প্রচারিত দীর্ঘদিনের আদর্শের বিপরীত। অনেকের আচরণ মধ্যযুগীয় শাসকদের দরবারে 'এনাম' প্রত্যাশী এক শ্রেণীর স্তাবকদের কথাই তখন সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কেউ দেশের বড় বড় আসন বা পদ লাভের প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্যে দল বিশেষ ও নেতা বিশেষের বাস্তব অবাস্তব বিশেষণবহুল স্তাবকতায় উঠে পড়ে লেগে যায়, অথচ তাদের পূর্ব ভূমিকা ছিল তাদের অনুসৃত এ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

স্বাধীনতার পরবর্তী শাসনামলে আমাদের অনেক সাংবাদিক সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে রীতিমত রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক পক্ষকে দিয়ে তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোমমর বেঁধে নেমেছিলেন। স্বাধীনতার পর সরকারীভাবে যেখানে কারুর ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছিল এবং দেশের আইন শৃঙ্খলাকে স্বাভাবিকতায় আনতে চেষ্টা চলছিল, তখন আমাদের অনেকের মাত্রাতিরিক্ত হিংসাত্মক মনোভঙ্গি দেশে জাতীয় ঐক্য এবং দ্রুত শান্তি-নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের উস্কানিমূলক ব্যবস্থা।

এভাবে মহলবিশেষকে উত্তেজিত করে বিভেদমূলক ভাবকে স্থায়ী করে রাখার প্রবণতা কিছুতেই নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার আওতায় পড়ে না। তাতে দেশ ও জাতির কোনো কল্যাণও নিহিত থাকে না। তাতে জাতীয় জীবনে অনৈক্য ও হানাহানির পরিধিই বৃদ্ধি পায়। সাংবাদিকতার মানের ক্ষেত্রে আমরা বহুদূর নিচে নেমে গিয়েছিলাম। যাবতীয় গণতান্ত্রিক অধিকারসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, একদিন এখানকার সংবাদপত্র যে ঐতিহ্য স্থাপন করেছিল, তা সেদিন বহুলাংশে হয়েছিল কলঙ্কিত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণসহ অপরাপর অন্যায়ের সমর্থন এবং অপরকে টেক্কা মেরে নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থের সংরক্ষণ বা তার পরিধি বৃদ্ধিতেই অনেককে অধিক তৎপর দেখা গেছে। সাংবাদিকদের সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্বে সমাসীনদের যথাযথভাবে নিজেদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা তৎকালীন সরকারকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধেও সহায়তা করেছে। সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টার চাইতে সহজ পন্থায় সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রবণতা ছিল কারুর মধ্যে সুস্পষ্ট। সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন অপেক্ষা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন যে অনেকের মূখ্য কর্তব্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কোনো দায়িত্বশীলের বিশেষ রাজনৈতিক দলে শামিল হবার পরোক্ষ অনুপ্রেরণা দান অনেককেই সেদিন হতবাক করেছে। জনগণ এবং সংবাদপত্রের অধিকার হরণকারীদের কণ্ঠে সুবিধাভোগী দায়িত্বশীলদের পুষ্পমালা অর্পণসহ ইত্যাদি তোষামোদ পরোক্ষভাবে সংবাদপত্র দলকেই উৎসাহিত করেছে। সাংবাদিকদের এহেন ন্যাক্কারজনক ভূমিকা তখন আন্তর্জাতিক প্রচার সংস্থাসমূহের দৃষ্টিকেও এড়ায়নি। দেশে বিদেশে সর্বত্র এখানকার সাংবাদিকতার তৎকালীন অনুসৃত ভূমিকাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে।

তৎকালীন ফ্যাসিবাদিতার রাজত্বে অধিকাংশ সংবাদপত্র সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলে যাওয়াতে সরকারী কাগজের সাংবাদিকরা বেশি মাত্রায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে, বেসরকারী কাগজের

সাংবাদিকরা তাদের নিম্নতম সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত থেকেছেন। তখন আমাদের মধ্যকার সাংবাদিকদের প্রতি প্রসারিত হয়নি কারুর ঐক্যবদ্ধ সহানুভূতির হাত। এ জাতীয় আরও বহুবিধা কারণ সাংবাদিকদের স্বার্থের প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তিসহ অন্যান্য বিষয় সাংবাদিকতার পেশায় স্বাভাবিকতার পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

রাজনৈতিক ময়দানে গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাক-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে যেমন এক শ্রেণীর লোক দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে, তেমনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুযোগেরও কোনোরূপ অপব্যবহার কারুর কাম্য নয়। রাজনীতি ও সাংবাদিকতা উভয়টিই দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার। এতে দায়িত্বহীনতা জাতির দুর্গতিই বাড়ায়। রাজনৈতিক চর্চার সুযোগকে কোনো রাজনীতিক কর্তৃক অপব্যবহারের ফলে তার আশু পরিণতের কথা ভেবে অনেক সরকার দলননীতি অবলম্বন করেন। তা করতে গিয়ে করা হয় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। এ জন্যে উভয়েরই উচিত পরিস্থিতিকে অতদূর পর্যন্ত যেতে না দেয়া। সংবাদপত্রের বেলায় প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার প্রবণতা যেমন রোধ হওয়া প্রয়োজন, আবার তাকে নিয়ে ক্ষমতাবানেরা বাড়াবাড়ি করুন এটাও কেউ চায় না। সৎ এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার সোনালী পরশে দেশ ও জাতি নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অনুপ্রাণিত হলে এবং দেশগড়া ও তার শ্রীবৃদ্ধির কাজে উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে এলে, তবেই আমাদের সাংবাদিকতা সার্থক হতে পারে।

কোনো কোনো সংবাদপত্র বা প্রচারমাধ্যম আজকাল অশ্লীলতাজনিত অপরাধসমূহের খবর পরিবেশন করতে বা বর্ণনা দিতে গিয়ে রোমান্স সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিংবা পত্রিকার কাটতি বৃদ্ধির জন্যে যেভাবে, যে ভাষায় এ জাতীয় ঘটনাকে পাঠক, দর্শক, শ্রোতাদের সামনে উপস্থান করে থাকে, তার মধ্য দিয়ে এ সংক্রান্ত অপরাধের ব্যাপারে সমাজকে সচেতন করা কিংবা এর প্রতিকারার্থে অনুরূপ ভাষণ ও বর্ণনার আশ্রয় না নিলেও বোধ হয় চলে। অনেকের বর্ণনা তো রীতিমতো অশ্লীলতাকেই উৎসাহিত করে, যা যুব চরিত্রের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অনেকে ভিন্ন সমাজের অপসংস্কৃতিকে চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ থেকে সংবাদপত্রের টেনে এনে যুব চরিত্র ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসের কাজ করতে আদৌ দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয় না।

দেশ ও জাতির প্রতি সংবাদপত্রের গুরুদায়িত্বের প্রেক্ষিতে শুধু সংবাদ পরিবেশনই একটি সংবাদপত্রের দায়িত্ব নয়, জাতির জন্যে প্রকাশিতব্য সংবাদটির কল্যাণ-অকল্যাণকারিতার দিকটিও লক্ষ্যনীয়। জাতির বিনির্মাণে তথা তাকে অধিকার সচেতন করা, তার উন্নয়ন পথের যাবতীয় কাটা অপসারণের

দ্বারা জাতিকে এগিয়ে নেয়া ও তাকে রুচিশীল, চরিত্রবান ও সুখী-সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তার সুস্থ মননশীলতা গড়ে তোলার প্রশ্নে একটি সংবাদপত্রের থাকে বিরাট ভূমিকা।

নেতিবাচক সমালোচনা দ্বারা জাতির মনকে বিষায়িত করার সাথে সাথে সমাজের যাবতীয় কলুষতার মূল কারণসমূহ কোথায়, সেগুলো চিহ্নিত করাও প্রচার মাধ্যমসমূহের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু সে কাজটি না করে অর্থাৎ খারাবির উৎসসমূহের ব্যাপারে জাতিকে সতর্ক বা পথ নির্দেশনা না দিয়ে কেবল খারাবির নগ্ন সমালোচনা কিছুতেই সুফল বয়ে আনতে পারে না বরং তার উল্টো প্রতিক্রিয়া সমাজের জন্যে আরো অধিক ক্ষতিই বয়ে আনে। সমাজ মানসে নিষ্ঠুরতাই গা-সওয়া হয়ে উঠে। এ প্রবণতা আজকাল প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে লক্ষ্যে হোক কি অলক্ষ্যে সমাজে নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি যাবতীয় অপরাধ প্রবণতার বর্ণনা দানে অনেকে যে পরিমাণ উৎসাহ প্রদর্শন করে থাকে, সে তুলনায় তার কারণসমূহ বর্ণনায় সৎ সাহস দেখাতে পারে না। এটা করতে গেলে হয়তো ইসলামের কথা বলতে হবে, এজন্য তারা এদিকটা এড়িয়ে যায়। আর কেউ সচেতনভাবেই এ থেকে দূরে থাকে। কারণ, তাদের কাছে সর্বরোগের মহৌষধ একটিই- অর্থাৎ বিশেষ একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। সেটির অনুপস্থিতির কারণেই নাকি সমাজের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অথচ কার্যত দেখা যায়, যারা অর্থাভাবে জর্জরিত তাদের তুলনায় ঐ সকল ব্যক্তি জঘন্য অপরাধে বেশি লিপ্ত, যারা প্রাচুর্যে আকুণ্ঠ ডুবে আছে-যারা স্বচ্ছল।

পরিবেশনার মাধ্যমের দিক থেকে এক শ্রেণীর খবর সম্পর্কে সত্য মিথ্যা উভয়েরই অবকাশ থাকে। এ কারণে কোনো সাংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথেই তার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করার প্রয়োজন থাকে বৈকি। আল-কুরআনেরও এটি শিক্ষা। খোদ মহানবী (সা.)ও অবাঞ্ছিত কোনো কথা কানে আসা মাত্রই বাছ-বিচার না করে তার ভিত্তিতে কিছু রটানোর ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। মহানবী (সা.) এর এ বাণীর আলোকে আমাদের সামনে সাংবাদিকতার একটি গাইড লাইন ফুটে উঠে। এ লাইনটির অনুসরণে সংবাদ পরিবেশনাজনিত অনেক ক্ষতিকর বিষয় থেকেই রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে যেগুলো চারিত্রিক কলুষতা সংক্রান্ত খবর, এগুলোর পরিবেশনায় ও শব্দ ব্যবহারে অনেক দিক থেকেই সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। কারণ, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মূল্যবোধ এমন যে, এ ব্যাপারে কোনো নিছক খবরই অনেক সময় অনেক পরিবারকে সামাজিকভাবে সকল সময়ের জন্যে হেয় প্রতিপন্ন করে

ফেলে ।মোটকথা, সংবাদপত্রে যে কোনো বিষয় প্রকাশকালে ব্যক্তিগত আর্থিক বা অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা লাভ কিংবা খ্যাতি ইত্যাদির চাইতে জাতীয় স্বার্থই সকল কিছুর উর্ধ্বে রাখাই সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্য ও কর্তব্য হওয়া উচিত ।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর মতে দেশের কৃষ্টি, তমুদ্দন ও জাতীয় ভাবধারাকে অক্ষুণ্ন রাখা, এর উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট হওয়া জাতীয় সংবাদপত্রের অন্যতম দায়িত্ব ।[১]

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সংবাদ ও সাংবাদিকতার পরিচয়

'সংবাদ' এটি বাংলা শব্দ । 'সংবাদ' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'News' একটি বচনহীন বা বচনোত্তীণ প্রত্যয় । বাংলা ভাষায় শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় সম্+বাদ= সংবাদ । 'সম' অর্থ সমসাময়িক বা সাম্প্রতিক আর 'বাদ' হলো উক্তি, বার্তা, কথন, ভাষণ, ইত্যাদি । অর্থাৎ সংবাদ বলতে সাম্প্রতিক বা সমসাময়িক বার্তা বা তথ্য পরিবেশনকে বুঝায় ।[২] আর সংবাদ শব্দটির প্রতিশব্দ ও ভাব অর্থ হিসেবে যে সকল খবরাখবর, বার্তা, বিবরণ, বৃত্তান্ত, সমাচার, নিউজ, বুলেটিন, সন্দেশ, উদ্দেশ্য, খোঁজখবর, তত্ত্ব, তালাশ, তথ্য সন্ধান, প্রতিবেদন ও বিবরণ রিপোর্ট ইত্যাদি ।

সংবাদ বলতে এখানে মূলত দৈনিক খবরের কাগজ সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, নিউজ এজেন্সি, বেতার বার্তা, রেডিও ও টিভি নিউজকে বোঝানো হয়েছে ।[৩]

ইংরেজি ভাষায় সংবাদের প্রতিশব্দ হলো । 'News' tidings, খবরাখবর, a report of fresh event নতুন ঘটনার সংবাদ, খবরের কাগজের সংবাদ, news paper, সংবাদপত্র, hot news তাজা খবর, টাটকা খবর, no news is good news কোন খবর নাই মানে খবর ভালো ।[৪]

১.এই সময় এই জীবন, মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫-১৬

২.Samsad English-Bengali Dictionary, Fifth Edition, Sahithya Samsad, Kolkata 9, P. 733.

৩.সংসদ সমার্থ শব্দকোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ কলকাতা, ২০০০, ২য় সংস্করণ

৪.যথা শব্দভাব অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

'সাংবাদিক' শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে যেসব শব্দ বেশি বেশি ব্যবহার হয় তার মধ্যে রয়েছে- সংবাদদাতা, প্রতিবেদক, নিজস্ব সংবাদদাতা, গোপন খবর, ভেতরের খবর, সঠিক খরব, পাকা খবর, মিথ্যা খবর ইত্যাদি। সংবাদদাতা, সংবাদ প্রতিনিধি, সংবাদবাহী, সংবাদ বাহক, খবরদাতা, সমাচারদাতা, ভাষ্যকার, জার্নালিস্ট, রিপোর্টার, স্টাফ রিপোর্টার, কলামিস্ট প্রভৃতি। সংবাদকে পুঁজি করে প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে সাংবাদিক বলা হয়।[৫]

সংবাদ বাJournal শব্দ থেকে Journalism ও Journalist শব্দের উৎপত্তি। Journalism অর্থ সাংবাদিকতা এবং Journalist অর্থ সাংবাদিক।

Webster's New world Dictionary তে আছে :

Journalist- a person whose accupation is journalism.

জার্নালিজম শব্দটি এসেছে ইংরেজি জার্নাল শব্দ থেকে। জার্নাল বলতে সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত মুদ্রিত উপস্থাপনাকে বুঝায়। সাংবাদিকতা শব্দটির প্রতিশব্দ হলো, সংবাদ সংস্থা, সংবাদ জগৎ, সংবাদ প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম, প্রেস, জার্নালিজম, মিডিয়া, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি। Webstar ডিকশনারিতে বলা হয়েছে Journalism is the work of gathering, writing, and publishing or disseminating news, as through news papers etc. or by radio and TV.[৬] সাংবাদিকতা চলমান জীবনের বাক্যময় প্রতিচ্ছবি, বা কখনও মৃন্ময় কখনও বস্তুনিষ্ঠ। সাংবাদিকতা এই প্রতিচ্ছবিকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করে তাকে আবার সাধারণের কাছে ফেরিয়ে দেয়ার এক জটিল পদ্ধতি। সাংবাদিকতা বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য ও দ্রুতলয়ের ইতিহাসের সংমিশ্রণ।[৭] আরবী ভাষায় সংবাদ শব্দটির অর্থ খবর।[৮]

---

৫. Samsad Eng-Ben. Dictionary, Ibid, P. 590.

৬.**Webster's New World Dictionary, David, B. Guralink, Oxford * IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. T.B, New Delhi, P. 15**

৭ .বিষয় সাংবাদিকতা, ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, লিপিকা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৫-১৬

৮.আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, ড. মুহম্মদ ফজলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, পৃ. ৫১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সাংবাদিকতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সর্বপ্রথম চীনে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৯১১ সালে চীনারা সরকারী ব্যবস্থাপনায় সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এরপর রোমানরা কিছু সংবাদপত্র প্রকাশ করে, তারপর অনেক বছর সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ থাকে বা প্রকাশিত হলেও তার ইতিহাস জানা যায়নি।

এরপর ১৫৩৬ সালে ভেনিসে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ হতে শুরু করে। এ সংবাদপত্রের মূল্য ছিল এক গেজেট। এ মুদ্রার নামকরণ থেকেই ভেনিস শহরে প্রকাশিত সংবাদপত্রের নামকরণ করা হয় 'গেজেট'। এ নামানুসারে ফরাসী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম ছিল গেজেট যা ১৬৩১ সালে প্রকাশিত হয়।[৯] মোঘল শাসনামলে সম্রাট বাবর থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত ১৫২৬-১৭০৭ সাল পর্যন্ত সময় ভারত উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। খবর সংগ্রহ ও তা লেখার জন্য মুসলিম শাসকবর্গ রাজদরবারে লেখক নিয়োগ দিতেন। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর সংগ্রহ করে তা রাজদরবারে পাঠাতেন, এর প্রায় একশত বছর পর ইংল্যাণ্ডে 'দি পাবলিক ইন্টেজেন্স' নামে ১৬৩৩ সালে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'দি নিউজ' বা 'উইকলি নিউজ' ১৬২২ খ্রি. প্রকাশিত হয়। সে সময় ডাকবাহী ঘোড়ার গাড়ীযোগে প্রচার করার জন্য সংবাদপত্র বাইরেও সরবরাহ করা হতো। বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক সংবাদপত্র 'দিগদর্শন' ১৮১৮ সালে, এরপর থেকে বাংলা ভাষায় অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হতে থাকে।[১০]

বাংলাদেশ গঠিত হবার অব্যবহিত পর আমাদের সাংবাদিকতার ধারা যে খাতে বয়ে চলেছিল তা সমাজের অনেক বিবেকবান মানুষের দৃষ্টিতেই পীড়াদায়ক ও নৈরাশ্যকর ঠেকেছিল।[১১]

৯.ছোটদের বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সম্পাদনা পরিষদ, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৬৭-৪৬৯

১০.প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮-৪৭২

১১.এই সময় এই জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সাংবাদিকতার ক্রমবিকাশ

দেশ ও জাতির কল্যাণে সংবাদ পত্রের গুরুদায়িত্বের প্রেক্ষিতে শুধু সংবাদ পরিবেশনই সংবাদপত্রের দায়িত্ব নয়, জাতির জন্য প্রকাশিতব্য সংবাদটির কল্যাণ-অকল্যাণকারিতার দিকটিও লক্ষ্যনীয়। সংবাদপত্র, তার এই গুরুদায়িত্ব সাংবাদিকতা চর্চার সূচনা থেকেই পালন করে আসছে। সাংবাদিকতা চর্চা মানবজাতির নানামুখী কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বহু বছর আগে চীন দেশে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতার সূচনা হয় কিন্তু ইসলামী ভাবধারার সাংবাদিকতা চর্চার ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। ইসলামী ধারার সাংবাদিকতা চর্চা প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে।

আরবী প্রবন্ধ সাহিত্য ১৮৫০ সালে ফরাসী আইনজ্ঞ মাইকেল ইউকুয়েম দি মনটিগ[১২] কতৃক প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে।[১৩] আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভাবক হিসেবে তিনি বিশ্ব সাহিত্য অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেছেন। প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া সাংবাদিকতা চর্চা বা সংবাদপত্রের ইতিহাস জানা খুব একটা সহজ বিষয় নয়। অবশ্যই কেউ কেউ এ ব্যাপারে অমত প্রকাশ করে বলেছেন, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা সাহিত্যের উদ্ভবের সাথে সাথে শিল্প হিসেবে প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার তথা সংবাদপত্র আবিষ্কারের বহু বছর পূর্বেই প্রবন্ধ সাহিত্য ও শিল্পের উন্মেষ হয়েছে। তবে প্রবন্ধ সাহিত্যের চর্চা ও প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে সাংবাদিকতা সাহিত্যের নিবিড় সম্পৃক্ততা অনস্বীকার্য।

ভাষার সাবলীলতা, নিপুন উপস্থাপনা ইত্যাদি প্রবন্ধ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যরূপে পরিনত হয়েছে। অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবন্ধ সাহিত্যের পদচারনা রয়েছে।

মিশরীয় প্রবন্ধ সাহিত্য নতুন স্তরে উন্নীত হয় হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর ত্রিশ-পঞ্চাশের দশকের সময়কালে। এ সময় প্রবন্ধ সাহিত্য রাজনৈতিক নীতি আদর্শের অনুগত হয়ে বহুলাংশে রাজনীতি বিষয়ক হলেও এর ক্ষেত্র আরো ব্যাপকহারে প্রসার হতে থাকে। সমাজের সামগ্রিক বিষয়গুলো সংবাদপত্র ও প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ হতে থাকে। অনেক ক্ষণজন্মা

১২.তার জন্ম-মৃত্যু সন- ১৫৩৩-১৫৯২

১৩.আল-আদাব ওয়া যুশূনুহু, ড. ইয-আল-ইসমাইল দার, আল ফিকর আল-আরাবী, তা.বি. পৃ. ১৭৭

ইসলামী সাহিত্যিক এদিকে এগিয়ে আসে, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, ড. ত্বহা হুসাইন, আব্দুর রহমান শুকরী, মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল সহ আরো অনেক বিখ্যাত লেখকদের আত্মপ্রকাশ ঘটে- যারা সারা বিশ্বে সাংবাদিকতা চর্চার বাণী ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, ,লেবানন, ইয়েমেন এবং তুরস্ক অঞ্চলে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতা চর্চা বিস্তৃত হতে থাকে।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আরবী সংবাদপত্রে পরিবতন ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে আরবী সংবাদপত্র ও ইসলামী ভাব ধারার সাংবাদিকতা চর্চা উন্নতির আধুনিকতায় পৌঁছে। এ পর্যায়ে আরবী সাংবাদিকতা ও ইসলামী ধারার সাংবাদিকতা চর্চা সাহিত্যের আধুনিক রূপ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনিত হয়।

পাশাপাশি ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, চিকিৎসা, বিনোদন, খেলাধূলা, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সংবাদ পরিবেশিত হতে শুরু করে।ইসলামী ভাবধারার সাংবাদিকতা চর্চা বৃহত্তর পরিসরে সম্প্রসারিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে এসে। ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, লেখক-সাহিত্যিক, গবেষকরা ইসলামী ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং ইসলামী ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং ইসলামী শিক্ষার বিস্তৃতির জন্য ইসলামী সাংবাদিকতা চর্চায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ মাওলানা কিসমতীর দৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা

সাংবাদিকতা কেবল দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনেই ব্যর্থ হয় না বরং জাতির জন্য বহুবিধ অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে যেমন সংবাদপত্রের উপর থেকে জনগণ আস্থা হারিয়ে বসে, তেমনি প্রয়োজনে সংবাদপত্রের কোনো মহত্তর ডাকে সাড়া দিতেও তাদের ইতস্তত করা স্বাভাবিক। পৃথিবীতে বহু একনায়ক শাসককে নিয়ে একশ্রেণীর সংবাদপত্রের নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের মানসে এরূপ ভূমিকা পালনের নজির রয়েছে।

বাংলাদেশ গঠিত হবার অব্যবহিত পর আমাদের সাংবাদিকতার ধারা যে খাতে বয়ে চলেছিল, তা সমাজের অনেক বিবেকবান মানুষের দৃষ্টিতেই পীড়াদায়ক ও নৈরাশ্যকর ঠেকেছিল। কেননা, কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ঐ সময় অনেকেই অবাস্তব ও ভিত্তিহীন প্রশংসা ও তোষামোদের ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, জনগণের অধিকার, তাদের কৃষ্টি-তমদ্দুন ও ন্যায্য দাবী-

দাওয়াসমূহের ব্যাপারে সরকারকে সচেতন করার জন্যে স্বল্প সংখ্যক সাংবাদিকেরই প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর অবদান ছিল তখন এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার পরিচয়ও কেউ দেয়নি যে, তা নয়।

রাজনৈতিক ময়দানে গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাক-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে যেমন এক শ্রেণীর লোক দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে, তেমনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুযোগেরও কোনোরূপ অপব্যবহার কারুর কাম্য নয়। রাজনীতি ও সাংবাদিকতা উভয়টিই দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার। এতে দায়িত্বহীনতা জাতির দুর্গতিই বাড়ায়। রাজনৈতিক চর্চার সুযোগকে কোনো রাজনীতিক কর্তৃক অপব্যবহারের ফলে তার আশু পরিণতির কথা ভেবে অনেক সরকার দলননীতি অবলম্বন করেন। তা করতে গিয়ে করা হয় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। এজন্যে উভয়েরই উচিত পরিস্থিতিকে অতদূর পর্যন্ত যেতে না দেয়া। সংবাদপত্রের বেলায় প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার প্রবণতা যেমন রোধ হওয়া প্রয়োজন, আবার তাকে নিয়ে ক্ষমতাবানেরা বাড়াবাড়ি করুন-এটাও কেউ চায় না। সৎ এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার সোনালী পরশে দেশ ও জাতি নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অনুপ্রাণিত হলে এবং দেশগড়া ও তার শ্রীবৃদ্ধির কাজে উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে এলে, তবেই আমাদের সাংবাদিকতা সার্থক হতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:মাওলানার প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা

নারীর সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষার প্রশ্ন	[প্রকাশ ঃ ৬. ৩. '৯৮ইং]
বাংলাদেশের ছিটমহল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য	[প্রকাশ ঃ ১০. ৩. '৯৮ইং]
অপরাধ প্রবণতা দূরিকরণে এর শিকড়ে যেতে হবে	[প্রকাশ ঃ ১০. ৪. '৯৮]
দলীয়করণ প্রবণতার বলি আর কত চলবে?	[প্রকাশ ঃ ১. ৬. '৯৮]
"মাদ্রাসা শিক্ষায়ও নকল" এবং কিছু কথা	[প্রকাশ ঃ ১২. ৬. '৯৮]
তালিবান সরকারের কতিপয় ঘোষণা	[প্রকাশ ঃ ১৭. ৭. '৯৮]
সমাজ ধ্বংসে বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্বহীনতা	[প্রকাশ ঃ ২০. ৭. '৯৮ইং]

নতুন বসনিয়া কসোভো সমস্যা কোন পথে?	[প্রকাশ ঃ ২. ৮. '৯৮ইং]
কসোভোর মানবাধিকার ও অন্যদের নীরবতা	[প্রকাশ ঃ ৯. ৮. '৯৮ইং]
আত্মরক্ষা, স্বাধিকারের সংগ্রাম ও সন্ত্রাস	[প্রকাশ ঃ ৩১. ৮. '৯৮ইং]
আফগানিস্তান ঘিরে নতুন সংকট সৃষ্টি না হোক	[প্রকাশ ঃ ৮. ৯. ৯৮ইং]
আফগানিস্তানে শান্তি চুক্তির আলোচনা	[প্রকাশ ঃ ২১. ৩. '৯৯ইং]
অভাবই স্বভাব নষ্টের একমাত্র কারণ নয়	[প্রকাশ ঃ ২২. ৩. '৯৯ইং]
সূর্যসেন যা, তাকে তাই বলা উচিত	[প্রকাশ ঃ ৫. ৫. '৯৯]
হত্যা অপরাধীর প্রাণদণ্ডে রয়েছে অন্যদের জীবনের নিরাপত্তা	[প্রকাশ ঃ ২৩. ৭. '৯৯ইং]
খেলাফতভিত্তিক রাষ্ট্রই জনদুর্গতি লাঘবের উপায়	[প্রকাশ ঃ ১১. ৯. '৯৯ইং]
কুরআনের আইন বিকৃত করার অপপ্রয়াস!	[প্রকাশ ঃ ১৩. ৯. '৯৯ইং]
'কেসাস' আইনের অনুপস্থিতিই ৬০ খুনের আসামী এরশাদ	[প্রকাশ ঃ ১৮. ৯. '৯৯ইং]
দায়িত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ উক্তি অবিচ্ছিন্ন	[প্রকাশ ঃ ১২. ১১. '৯৯ইং]
ভারত ও বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের অন্তরালে	[প্রকাশ ঃ ৬. ৪. ২০০০ইং]
সৌদি আরবে 'গুরু অপরাধে' 'গুরুদণ্ড' দান প্রসঙ্গে	[প্রকাশ ঃ ২৩. ৯. ২০০০ইং]
রমযানের পবিত্রতা রক্ষায় সরকারি ভূমিকায় বৈপরীত্য প্রসঙ্গে	[প্রকাশ ঃ ২২. ২. ০১]
তালেবানদের মূর্তি ধ্বংসের প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা	[প্রকাশ ঃ ১৫. ৩. ২০০১ইং]
রমযানের ডাক ঃ ফযীলত ও প্রাসঙ্গিক কথা	[প্রকাশ ঃ ১৭. ১১. ২০০১ইং]
সেই সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া	[প্রকাশ ঃ ২. ১০. ২০০২ইং]
ইরাকের উপর সম্ভাব্য হামলা সুদূরপ্রসারী মার্কিন পরিকল্পনারই অংশ?	[প্রকাশ ঃ ১৫. ১. ২০০৩ইং]

জাতি গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা [প্রকাশ ঃ ১৭. ১. ০৩ইং]

দত্তদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা রুখতে হবে [প্রকাশ ঃ ২৬. ২. ২০০৩ইং]

সামূদ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের পরও কি ইরাক বিরোধী যুদ্ধোন্মাদনা থামবে? [প্রকাশ ঃ ৫. ৩. ২০০৩ইং]

জাতীয় ঐক্যে ফাটল ও তার সুফল ভণ্ডুলের অপচেষ্টা চলছে [প্রকাশ ঃ ১৩. ৩. ২০০৩ইং]

রাজনৈতিক অঙ্গনের অপসংস্কৃতি দূর হোক [প্রকাশ ঃ ১৪. ৫. ২০০৩ইং]

জাতিসংঘের প্রতি বুশ-ব্লেয়ারদের বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের নৈপথ্য রহস্যঃ দ্যাগ হেমারশোল্ডকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? [প্রকাশ ঃ ২. ৪. ২০০৩ইং]

আত্মঘাতী হামলা ও বিশ্বনেতৃত্বের ভাববার বিষয় [প্রকাশ ঃ ২১. ৫. ২০০৩ইং]

বিশ্বময় সৃষ্ট গণ-চেতনাকে এগিয়ে নেয়াই সমস্যা উত্তরণের পথ [প্রকাশ ঃ ২৮. ৫. ২০০৩ইং]

কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা জরুরী *[প্রকাশ ঃ ৪. ৬. ২০০৩ইং]*

আমাদের ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক কাঠামো ও ক্রমবর্ধমান সামাজিক অপরাধপ্রবণতা [প্রকাশ ঃ ১১. ৬. ২০০৩ইং]

বাংলাদেশের যুবশক্তি কি এভাবে খুনাখুনি করে শেষ হতে থাকবে? [প্রকাশ ঃ ২৫. ৬. ২০০৩ইং]

বিকৃত সন্তানের নির্মম শিকার এবার খোদ মা-বাবাও [প্রকাশ ঃ ৩০. ৭. ২০০৩ইং]

এক অপরাধের প্রতিবাদে অন্য অপরাধ [প্রকাশ ঃ ২৩. ৮. ২০০৩ইং]

আরাফাতের বহিস্কৃতি সকল আরব নেতারই বহিস্কৃতির সংকেত [প্রকাশ ঃ ১৭. ৯. ২০০৩ইং]

পারমাণবিক গুণ্ডামি ঃ আজ ইরান কাল সিরিয়া পরশু পাকিস্তান? [প্রকাশ ঃ ২৪. ৯. ২০০৩ইং]

অপসংস্কৃতি দ্বারা ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র নবী জীবনেই শুরু হয়েছিল [প্রকাশ ঃ ৮. ১০. ২০০৩ইং]

সন্ত্রাস-দুর্নীতি দমনে কুরআনী শাসনের দাবী প্রসঙ্গ	[প্রকাশ ঃ ১২. ১১. ২০০৩ইং]
সৌদি আরবে আত্মঘাতী বোমা হামলা ও প্রাসঙ্গিক কথা	[প্রকাশ ঃ ১৯. ১১. ২০০৩ইং]
ভবিষ্যতে ইরাকী স্টাইলই কি হবে সবলদের হাত থেকে দুর্বলদের বাঁচার উপায়?	[প্রকাশ ঃ ২৯. ১১. ২০০৩ইং]
একটি নিহত সত্যের পুনরুজ্জীবন ও প্রাসঙ্গিক কথা	[প্রকাশ ঃ১৭. ১২. ২০০৩ইং]
সার্ক-নেতৃবৃন্দের প্রতি একটি মানবিক আবেদন প্রসঙ্গ	[প্রকাশ ঃ ৭. ১. ২০০৪ইং]
নিছক শ্লোগান ও দেহ প্রদর্শনী নারী মর্যাদা নয়	[প্রকাশ ঃ ১৮. ৩. ২০০৪ইং]
ইরাক-আফগানযুদ্ধ মুসলিম নেতাদের চোখ খুলে দিক	[প্রকাশ ঃ ২৩. ৪. ২০০৪ইং]
ইরান সিরিয়া ও সুদান পরিস্থিতি কোন দিকে	[প্রকাশঃ ১১. ১০. ২০০৪ইং]
ইসলাম ও মধ্যপন্থা নীতি	[প্রকাশ ঃ ২৮. ১১. ০৪]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃমাওলানা কিসমতীর সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ

আফগানিস্তান নিয়ে মাওলানা কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চাঃ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী আফগানিস্তান সংকট এবং বিদেশী শক্তি কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে ১৯৯৮ সালেই সংশয় প্রকাশ করে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি যে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তা পরে আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রান্ত ও ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন- মুসলিম দেশসমূহের ভিতরে বাইরে আজ অগণিত সমস্যা। উপরন্তু যেসব দেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসনের প্রয়াস বিদ্যমান কিংবা সেই শাসনবিধি চালুর সম্ভাবনা ঘনিষ্ঠ অথবা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের লোকেরা সংশ্লিষ্ট দেশের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, ঐ সকল দেশের বিরুদ্ধে ইসলামের আন্তর্জাতিক শত্রুরা অতীব সক্রিয়। ঐসব বৈরী শক্তি প্রথমে চায় দেশটির অভ্যন্তরে তাদের নিয়োজিত এজেন্ট ও ভাবশিষ্যদের দ্বারা উক্ত ইসলামী দলকে ঘায়েল করতে, তাদের দ্বারা সেই দল ও দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে। নিজেদের অনুগত সরকার দ্বারা দলটিকে কোনঠাসা করতে। দলের প্রচার মিডিয়াকে অচল বা দুর্বল করতে।

আফগান মুজাহিদদের হাতে সাবেক সোভিয়েত বাহিনীর পরাজয় এবং তাদেরই পুতুল সরকারের পতনের পর দেশটিতে শান্তি–শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু তা না হয়ে সেখানে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারাবদ্ধ মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয় এবং পরে তারা ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তার নেপথ্যে কারা কাজ করেছে? যুদ্ধবিধ্বস্ত শত শত আফগান নাগরিকের রক্তে দেশটি রঞ্জিত হয়ে আসছে, যার জের এখনও চলছে।

মোটকথা- মুসলিম ও ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিগুলোর এসব জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের ইতিহাস সামনে থাকা সত্ত্বেও দুই মুসলিম রাষ্ট্রের কোনো ইস্যু নিয়ে বিরোধের মুহূর্তে হঠাৎ মাথা গরম করে বড় রকমের যুদ্ধ প্রস্তুতি কারুর পক্ষ থেকেই সঙ্গত নয়। আজকের বিশ্বমুসলিম একে অবশ্যই নিন্দার চোখে দেখবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নকলের বিরুদ্ধে মাওলানা কিসমতীর কলম যুদ্ধ

স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নকলের ভয়াবহতা সম্পর্কে মাওলানা কিসমতী বলেন, মাদ্রাসা-শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সুস্পষ্ট থাকা কর্তব্য। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের জীবনের যেই উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদেরও থাকতে হবে সেই অভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আর এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র তাদের সম্মানিত শিক্ষকদেরই। এই লক্ষ্য কোনো মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীর কাছে অস্পষ্ট থাকলে তার পক্ষে কিছুতেই মানোন্নীত আলেম-তথা খাঁটি ধর্মীয় শিক্ষিত ও যথার্থ জ্ঞানী হয়ে গড়ে উঠা সম্ভব নয়।

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে মাওলানা কিসমতীর কলম, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংসের যে পরিকল্পনা করেছে সে সম্পর্কে বলেন, ২৭ শে মে ২০০৩, ওয়ালস্ট্রীট জার্নালে প্রকাশিত এক তথ্য মতে, মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামস ফেল্ড বলেছেন, ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর সেখানে সাদ্দামের পতনের পর ইরাকের প্রতিবেশী দেশগুলো সেখানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, যা ওয়াশিংটন কখনও মেনে নেবে না।

'সন্ত্রাস বলতে সাধারণত যা বুঝায় এর সাথে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী লোকদের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তারা আল-কায়েদা, উসামা বিন লাদেনের অনুসারী। উসামা এবং আল-কায়েদা বলতে যে বা যাদেরকে বুঝানো হচ্ছে, তাদের কাজ কোনো নিরপেক্ষ আদালতে দলীল প্রমাণ দ্বারা আপত্তিকর বলে কখনও প্রমাণিত না হলেও এই শ্লোগান, এই প্রতীকী শব্দই এখন দেশে দেশে ইসলামী লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগে আনয়ন করা হচ্ছে।

একটি দেশের জাতীয় ঐক্যের সুফল এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, জাতির ঐতিহাসিক সফলতাগুলো জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমেই আসে, আর সেই ঐক্য সকল সময়ই নিষ্ঠাপূর্ণ থাকে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট জাতির অভ্যুত্থানসহ তার বীরত্ব, উন্নতি, সমৃদ্ধি, স্থিতি ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাফল্যের ধারা ততোদিনই ব্যাহত থাকে, যতদিন সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের মধ্যে বহাল থাকে তাদের জাতীয় ঐক্যের সেই চেতনা। বলাবাহুল্য গোটা দেশবাসীর যৌথ স্বার্থকে কেন্দ্র করে একটি অভিন্ন লক্ষ্য অর্জন দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হলেই জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। ঐক্যের এই শক্তি হয় অপরাজেয় ও অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু কোনো জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির এই অপ্রতিরোধ্য শক্তিটি তখনই দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন এর

উল্লেখিত অভিন্ন লক্ষ্য থেকে কোনো নেতা বা শ্রেণীর বিচ্যুতি ঘটে এবং সেখানে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত দলীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ এসে বাসা বাঁধে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা এরূপ খণ্ডিত স্বার্থচিন্তাই জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরায়। তাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে। ঐক্য শক্তির এই বিভক্তিতে এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়, যার পরিনাম হিসাবে ব্যাহত হতে থাকে জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি সকল কর্মপ্রয়াস।

নারীর সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষা সম্পর্কে কলম সৈনিক মাওলানা কিসমতী

নারীদের সম্মান নারীদের নিজেদেরকেই রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। পুরুষশাসিত সমাজের আনন্দের খোরাক হওয়া যাবে না। দু:খজনক ও লজ্জাকর ব্যাপার হলেও আমাদের দেশের সংবাদপত্রে আজকাল প্রায় দিনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হবার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। কোনো কোনো দিনের পত্রিকায় এক সাথে একাধিক ধর্ষণ ঘটনার খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশ পাচ্ছে। একসময় এরূপ একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ পাওয়ার পর যেখানে এ ঘটনার সংগঠকের বিরুদ্ধে সামাজিক ঘৃণা ক্ষোভের উদ্রেক হওয়াটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে প্রাণান্তকর হয়ে দাঁড়াতো, বর্তমানে এরূপ খবর জানাজানির পরও অপরাধিরা থাকে বেপরোয়া। এসব বিষয় এমন গা সওয়া হয়ে গেছে যে, খোদ খুনের ঘটনার খবরে যেমন মানুষ আগের মতো এখন আর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে না, তেমনি নারী সম্ভ্রম বিনষ্টের বহু জঘন্য খবরাখবরেও কাউকে তেমন বিচলিত হয়ে উঠতে দেখা যায় না। অপরদিকে এসব অপরাধের সাথে জড়িত থেকেও অর্থ ও মাস্তানির জোরে বুক ফুলিয়ে সমাজে বিচরণ করে।

মোটকথা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো মুসলমানের ঈমানের দাবী হলো, জীবনের সকল স্তরে খোদায়ী বিধানের প্রতি সম্মান দেখানো এবং যে কোনো প্রতিকূলতার মাঝেও সেই নীতির উপর অটল থাকা। পর্দাকে প্রগতির অন্তরায় মনে করা না হলে এবং নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির অবাস্তব দর্শনের অনুসারী হয়ে ইসলাম পরিপন্থী কায়দায় একাকি উক্ত মহিলা আজমীর সফরে বের না হলে হাওড়ার নারী সংঘটিত লজ্জাকর ঘটনাটি হয়তো আদৌ ঘটতো না। সুতরাং ঘটনার মূল কার্যকারণ ও পটভূমি নিয়েও সকল মুসলমানের চিন্তা করা প্রয়োজন।

কুরবানীর লক্ষ্য নিয়ে মাওলানা কিসমতী প্রবন্ধ

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যাবে কুরবানির মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কুরবানি অনুষ্ঠান প্রতিবছর আমাদেরকে এই আহ্বানই জানিয়ে যায় যে, নিজের কামনা-বাসনা, ব্যক্তিসত্তা, কষ্টার্জিত সম্পদ ও প্রাণাধিক প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির সামনে সমর্পণ করা। কুরবানি একদিকে যেমন ত্যাগের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মহান নবী ইব্রাহীম (আ.) এর ত্যাগদীপ্ত সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপটে জাগিয়ে দেয়, তেমনি প্রতিটি মুমিন অন্তরকে ঈমানী চেতনায় করে তোলে উজ্জীবিত।

আমরা যে মুহূর্তে প্রতিবছর পশুর গলে ছুরি চালিয়ে ঈদুল আযহার কুরবানী উদযাপন করি সে সময় বিশ্বের দিকে দিকে আমাদের মুসলমান ভাই-বোনেরা নমরূদী শক্তির হাতে যবেহ হতে থাকে। ঈদুল আযহার কুরবানী অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সফল করে তুলতে হলে প্রতিটি কুরবানী দাতাকে আগে নিজের খোদা তায়ালার নির্দেশিত কুপ্রবৃত্তিকে 'কুরবানী' দিয়ে নিজ সমাজ থেকে অজ্ঞতা জনিত অন্যায় অবিচারকে উৎখাত করতে হবে। মূলত ইব্রাহীম (আ.) এর ন্যায় ঈমানী তেজ ও সংগ্রামী চেতনা নিয়ে নমরূদী পশুত্বের হাত থেকে মানবতাকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে বাঁচাতে হবে।

নিরাপত্তা ও শান্তির লক্ষ্যে 'কেসাস' আইনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সাংবাদিকতা চর্চা এ প্রসঙ্গে যুক্তির অবতারণা করেছেন, বর্তমানে সারাদেশে প্রায় প্রতিদিন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক বিভিন্ন নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটছে। সন্ত্রাসী তৎপরতা, বিপুল অর্থ ছিনতাই, নারী ধর্ষণ, ডাকাতি রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধমূলক তৎপরতায় দেশবাসী হতবাক।

সমাজে সাম্প্রতিককালের ক্রমবর্ধমান হত্যা-খুনের ঘটনাবলী একথারই প্রমাণ যে, মানব রচিত আইনের দ্বারা মানুষের শান্তি আনতে পারে না, এ জন্যে মহান আল্লাহর প্রদত্ত নিরপেক্ষ আইনই প্রয়োজন। এটি যেমন ন্যায়ভিত্তিক তেমনি যৌক্তিকও। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা রোধকল্পে সমাজ থেকে হত্যা অপরাধ উচ্ছেদ ও হত্যাকারীর জন্যে প্রাণদন্ডের বিধান রেখেছেন, যাকে এক এক সময় পশ্চিমা বস্তুবাদী সমাজ বর্বরতাপূর্ণ আইন বলে আখ্যায়িত করলেও আজ তার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। গুরু অপরাধে গুরুদণ্ড এবং লঘু অপরাধে লঘু দণ্ড প্রদান মূলত অপরাধীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করারই নামান্তর, যা এই অপরাধ দমনে কিছুতেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হতে পারে

না। আল্লাহ এই মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, ওয়া ফিল কিসাসে হায়াত- অর্থাৎ "কিসাস বা খুনীর প্রাণদণ্ডের মধ্যেই রয়েছে (অপর) মানুষের জীবনের নিরাপত্তা"।

দুনিয়াতে আল্লাহর বিধানকে আমরা উপেক্ষা করলেও একদিন তার দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া উপায় নেই, এই বাস্তবতা সকলের সময় থাকতে স্বীকার করে নেয়া কর্তব্য।

অভাবই স্বভাব নষ্টের একমাত্র কারণ নয় এ প্রসেঙ্গ মাওলানার বক্তব্য হলো- "অভাবেই স্বভাব নষ্ট"- এই প্রবাদ বাক্যটি ক্ষেত্র বিশেষে সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজন্য নয়। অনেক দরিদ্র রিকশা-বেবী চালকও যাত্রীর ভুলে ফেলে যাওয়া লাখো টাকার বান্ডিল তার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়ার নজির আছে। প্রবাদে বর্ণিত বদ্ধমূল ধারণার কারণ হলো বস্তুবাদী শিক্ষা মানুষকে সম্পূর্ণ পেটসর্বস্ব ভোগবাদী জীব বলে গণ্য করে এবং তাকে ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক সত্তায় পরিণত করে।

মূলত আর্থিক অভাব অপরাধের একটি কারণ হলেও নৈতিকতার অভাব ও অবক্ষয়ই যে অপরাধের মূল কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অতীব সমৃদ্ধ দেশের অপরাধপ্রবণতার ক্রমবর্ধমান সংখ্যাই তার প্রমাণ।

ইসলামী আইন নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় নয়

এ প্রসঙ্গে মাওলানার কলমী যুক্তি দ্বারা ইসলামে নারীদের সম্মান, অধিকার ও স্বাধীনতার কথা তুলে ধরেছেন। পৃথিবীতে নারী স্বাধীনতার যথেষ্ট ঢাকঢোল পেটানো হয়। পশ্চিমা বিশ্বে এবং তাদের প্রাচ্যের দোসররা নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের উপর দীর্ঘদিন থেকে জোরেশোরে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে নারী নির্যাতনের সংঘটিত কোনো ঘটনাকে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হচ্ছে এবং মুসলিম সমাজের নারীদেরকে সবসময় জুলুম-নিপীড়নের শিকার হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। অথচ পাশ্চাত্য সমাজেও নারীরা কম নির্যাতনের শিকার নয়। এই পরিস্থিতির পাশাপাশি আরেকটি নতুন প্রবণতা হলো পুরুষদের নিন্দাবাদ ও তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা। বিশেষ করে মুসলিম পুরুষদের নারী নির্যাতনকারী হিসেবে প্রমাণ করার পাশ্চাত্য প্রবণতা যেন একটু বেশিই মনে হয়। ইসলাম সম্পর্কিত যেসব ভ্রান্তধারণা ও কুসংস্কার প্রচলিত আছে, সেগুলো বেশি বেশি করে ফ্লাস করা হয়ে থাকে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালনাকারী নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সংকীর্ণমনা, অত্যাচারী, মানবতার দুশমন এবং অনুদার প্রমাণ করার চেষ্টা চলছেই।

নারী অধিকারের প্রশ্নে তাদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার পাশাপাশি আরেকটা উদ্বেগজনক বিষয় হলো- এসব ধারণাকে তারা বিশ্বময় ব্যাপক প্রচারের এক অভিযান শুরু করেছে। মুসলিম সমাজের নারীদেরকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার নানা চেষ্টা চলছে।

মূলত গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মুসলিম দেশসমূহের যেখানে পুরুষ দ্বারা নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে বলে মনে হয়, তা ইসলামের কারণে নয়, বরং ইসলাম থেকে দুরে সরে থাকার কারণেই এমনটি হচ্ছে। কারণ, এমন লোকের সংখ্যা অনেক কম, যারা সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষায় আদর্শ সম্পর্কে অবগত এবং ইসলামী নীতিমালার অনুসারী। অন্যথায় ইসলাম নারীদের যে অধিকার এবং মর্যাদা দিয়েছে, পাশ্চাত্য সমাজে শত চেষ্টা করেও নারীরা সেই অধিকার এবং মর্যাদা আজও পায়নি। বরং তাদের প্রদত্ত 'সাম্য ও স্বাধীনতার' শ্লোগান নারীদের ভাব-মর্যাদা ও তাদের প্রকৃত শান্তি-সুখকেই ধ্বংস করেছে।

ইসলামের সঠিক শিক্ষা, বিধি-বিধান এবং তাতে নারীদের অধিকার, কর্তব্য ও মর্যাদার বিষয়সমূহ শুধু মুসলিম নারীদের কাছেই নয়, জাতি, ধর্ম ও অঞ্চল নির্বিশেষে গোটা বিশ্ববাসীর সামনেই যে এগুলো উপস্থাপন জরুরী উল্লেখিত পরিস্থিতি তারই দাবী করছে। নারী অধিকার ও নারী মর্যাদা সম্পর্কিত যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে ও সকল অপপ্রচার রোধেও মুসলিম দায়িত্বশীলদের উদ্দ্যোগী হওয়া কর্তব্য। জাতির সত্যিকার দরদী বুদ্ধিজীবী মহল, এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা এবং ইসলামের নারী অধিকার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করা সকলেরই নৈতিক, ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য। এই কতৃব্য সঠিকভাবে পালনের মধ্য দিয়েই নারী সমাজের যথার্থ কল্যাণ, তাদের অধিকার ও প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়কে নিশ্চিত করতে হবে।

তাবলীগ-এ-দ্বীনের সফলতার জন্য যা আবশ্যক, এ প্রসঙ্গে মাওলানা কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চা। ইসলামের বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে মানার প্রয়োজনীয়তা ও ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বলেন, বিশ্ব ইজতেমায় বিশ্বের বহু দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানদের আগমনে ও তাদের সেসব ভাষার বক্তৃতা ও সেগুলোর বাংলা অনুবাদের সুব্যবস্থা, ইসলামী ঐক্য, শৃঙ্খলা, সাম্য ও সহমর্মিতার এক বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের অবতারণা ঘটায়। এই মহাধর্মীয় সমাবেশের বক্তব্য শুনে এবং হৃদয়ে ধারণ করে মুমিন-মুসলমানরা নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। তবে তাবলীগ এবং এই বিশ্ব ইজতেমার সঠিক মর্ম অনুধাবন ও অনুসরণ করতে হবে আল-কুরআন, নবী জীবন ও তাঁর ত্যাগদীপ্ত সংগ্রামী

সাহাবীদের জীবন-দর্পণের আলোকে। তবেই এই তাবলীগ ও এই বিশ্ব সম্মেলন যেমন অধিক সার্থক ও সফল হবে, তেমনি সমাজ থেকে সন্ত্রাস, অন্যায়, অনাচার, শোষণ-বঞ্চনা ও জুলুম নিপীড়ন দূরীভূত হয়ে যে কোনো জনপদ ও ভূখণ্ডে শান্তি-সুখের ফল্গুধারা বয়ে যেতে পারে।

তাবলীগ ও দ্বীনের দাওয়াতসহ আমাদের জীবনের সকল স্তরের কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে দৈনন্দিন কার্যাবলীতে আমরা যা কিছু করবো প্রত্যেক কাজের মধ্য দিয়ে আল-কুরআনের দাবী কতদূর পূরণ হচ্ছে ক্ষংে নবী জীবনের আদর্শের প্রতিফলন ও সামঞ্জস্য কতদূর রয়েছে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কর্মধারা কুরআন সুন্নাহর মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক, না তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, সবে বিষয় সূক্ষ্মভাবে নজর রাখতে হবে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, আমরা লক্ষ্যের চাইতে অনেক উপলক্ষ্যকে বেশি প্রাধান্য দিতে যাওয়ায় মূল লক্ষ্য আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে যায়।

সুতরাং 'তাবলীগে-এ-দ্বীনে'র সাথে সাথে ইজহার-এ-দ্বীন এবং ইকামত-এ-দ্বীনের ও চেতনা না থাকাটা সম্পূর্ণরূপে কুরআন, ইসলামী আকীদা, সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবার বিরোধী। আল্লাহ এ বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থেকে নবী জীবনের আদর্শে আমাদের সকলকে তাবলীগে দ্বীনের সাথে সাথে ইজহারে দ্বীনের আন্দোলনের ও তওফীক দিন। আমীন!

সন্ত্রাস-দুর্নীতি দমনে কুরআনের বাণী

এ প্রসঙ্গে মাওলানা কিসমতীর প্রবন্ধ। সন্ত্রাস, দুর্নীতি আমাদের সমাজের এই প্রধান দু'টি সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলেন, ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক সকল দিক থেকেই সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী তৎপরতা মানবতাবিরোধী, নিন্দিত ও ধিকৃত এক অপরাধপ্রবণতা। এর কার্যকারণ যাই থাক না কেন, এই অমানবিক, পাশবিক প্রবণতা কোনো সমাজে প্রশ্রয় পাবার অর্থই হলো সংশ্লিষ্ট সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের সকল প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দেয়া এবং সমাজের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহকে অচল করে দেয়া।

সৌদি আরবে ইসলামী বিধানের আংশিক প্রয়োগের কারণেই যদি বিশ্ববাসী এই জটিল সমস্যায় এমন সুফল পেতে পারে, সেক্ষেত্রে কোনো দেশে পূর্ণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি তার পূর্ণ অবয়ব নিয়ে কার্যকর করা হয়, বিশেষ করে কুরআনে বর্ণিত খোদায়ী অর্থনৈতিক বিধান ও অপরাধ দমন

আইন চালু হয় তাহলে সেখানে যে অতি সহজেই এক সুখী-সমৃদ্ধ, শান্তিময় উন্নত নিরুপদ্রব সমাজ বিনির্মীত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, একমাত্র ইসরামী জীবন দর্শনেই রয়েছে মানুষের অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণের সঠিক ও যুক্তিগ্রাহ্য পন্থা, যা অপর কোনো বিধানে নেই। কেননা মানুষের মনে অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টির পেছনে যেসব কার্যকারণ বিদ্যমান সেগুলো নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা মানবরচিত বিধি-বিধানে নেই।

সর্বক্ষণ সৎ প্রবণ থাকা ও অসৎ প্রবণতা বর্জনের এই অনুভূতি ও অভ্যাসকে ধরে রাখার জন্যেই রাত-দিনের অন্যান্য নির্ধারিত ধর্মীয় কাজ করতে হয়। এ ছাড়াও সাপ্তাহিক জুমা, বাৎসরিক একবার মাহে রমযানের তাকওয়া বা সংযম, আল্লাহর ধ্যান, গবেষণা ও অনুশীলন দ্বারা অন্যায় থেকে বিরত থাকার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থ বুঝে কুরআন চর্চা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে একজন লোক তার প্রতিটি কাজের জন্য এক মহাসত্তার কাছে জবাবদিহির অনুভূতিকেই নিজের মধ্যে বারবার জাগিয়ে তোলে। ফলে এসব কিছুর মধ্য দিয়ে মানুষ যেমন ন্যায়-অন্যায়ের সীমা মেনে চলতে অভ্যস্থ হয়ে যায়, তেমনি অপরাধপ্রবণতার মুল প্রেরণা অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণের প্রবণতাও তার মধ্যে আল্লাহর ভয় হ্রাস পায়। মহাশক্তিধর আল্লাহর কাছে নিজের সকল কাজ-কারবারের জবাবদিহিতার এই ভয় মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে।

নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চা

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার সচেতনতা ও নারী কর্মসংস্থান এখন অতীতের তুলনায় অনেক বেশী। নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন সংসারে নগদ পয়সা আয় করে। দেশের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগে এমনকি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দায়িত্বও নারীরা আজকাল পালন করছে। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের দেশে নারীদের জীবনে যেই নিরাপত্তা থাকার কথা ছিল, তা অনুপস্থিত।

চাকরিক্ষেত্র হোক বা অন্যত্র, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজের অন্ধানুসরণে মুসলিম-অমুসলিম সমাজে কেউ তেমন প্রকৃত শান্তির মুখ দেখেনি। কেননা, ইসলাম একটি প্রকৃতি সম্মত ধর্ম। ইসলামী বিধান ও মূল্যবোধ বিরোধী জীবনাচার গ্রহণ মূলত প্রকৃতি বিরোধী কাজ করা, যাতে কিছুতেই

সফলকাম হওয়া যায় না। প্রকৃতিরই দাবী হলো, যেসব নারী জীবনোপকরণের অপর কোন পথ নেই, সেসব নারীর কর্মস্থল ও কর্মপরিমণ্ডল এমন হওয়া উচিত, যাতে তাদের সকল প্রকার অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত থাকে। এ কারণেই এইব্যবস্থাকে ইসলামে অপরিহার্য করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ প্রকৃতি বিরোধী এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শুধু নিজেদের সমাজেরই সর্বনাশ করেনি, তাদের দীর্ঘদিনের প্রভাব বলয়ের অন্যান্য সমাজেরও ক্ষতি করেছে। এখন তাদের মধ্যেই যেখানে এর ক্ষতিকর দিকটি আপত্তিকর মনে হচ্ছে এবং এসবকে অপরাধ গণ্য করে এর শাস্তি দাবী করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তো মুসলিম সমাজের এ ব্যাপারে আরও দ্রুতএগিয়ে আসা উচিত।

আজকের মুসলিম নারী সমাজকে জীবনের বাস্তবতার দাবী পূরণ করতে গেলে পশ্চিমের ভোগবাদী জীবন দর্শনের অনুসারী হতে হবে- এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে হবে। যা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এক শ্রেণীর তথাকথিত আধুনিকা প্রগতিবাদী মহিলারা পেশ করেন। বরং নিজস্ব স্বকীয়তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করেই যে জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কঠোর বাস্তবতার মোকাবেলা করা যায়, সেই দৃষ্টান্তই তাওহিদী জনতার এই দেশের নারীদের স্থাপন করতে হবে।

দূর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার মাওলানা কিসমতী

একটি দেশের উন্নতি-অগ্রগতি তথা সার্বিক সফলতার অন্তরায় হল দুর্নীতি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি বলেন, কারও প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সমর্থনের একটি সংগত কারণ থাকে। সেই গুণগত কারণ চলে গেলে তখন আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলের প্রতি সেই সম্মান-শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সমর্থন থাকে না। তখন সমর্থিত ব্যক্তি বা দলও তা দাবী করার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। দাবী করলেও তাতে কোনো কাজ হয় না। এ কারণে সকল সময় এ সম্পর্কিত অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর্তব্য। কিন্তু এটাও ইতিহাসের আরেক বাস্তবতা যে, স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চায় না। যখন বিপর্যয় দেখা দেয় তখন শিক্ষা নিতে চাইলেও তাতে ব্যর্থ হতে হয়। বিশেষ করে আমি এখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন দলের আকাশচুম্বী জনসমর্থন আবার জনগণ দ্বারা তার প্রত্যাখ্যাত হবার কথাই বলতে চাচ্ছি।

অপরাধী তার যথার্থ শাস্তিনা পাওয়া অপরাধের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। সুতরাং আমরা মনে করি, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও অন্যান্য সেক্টরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে দুর্নীতিবাজদের দ্রুত বিচারের সম্মুখীন করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

এদেশের জনগণের বহুবার আশাভঙ্গ হয়েছে। এভাবে আবারও আশাভঙ্গের ঘটনা ঘটলে তাদের মধ্যে যেই হতাশা দেখা দেবে, সেটা জাতির উৎসাহ-উদ্দীপনাকে চরমভাবে বিনষ্ট করে দিতে পারে, যার পরিণতি এ দেশ ও জাতির জন্যে ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ পরিণতি। দেশবাসী দ্রুত তাই দেখতে চায় যে, দেশ দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে মাওলানা কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চা

সমাজে মাদকাশক্তির বিস্তার ও এর কুফল সম্পর্কে মাওলানা কিসমতী বলেন, বলাবাহুল্য, যেসব কিশোর যুবক মাদকাসক্তির শিকার হয়ে মাদকদ্রব্যের টাকার জন্যে এভাবে নিজ জন্মদাতা মাতা-পিতা ও নিষ্পাপ শিশুকে পর্যন্ত খুন করতে দ্বিধা করে না, তারা যে নিজেদের এই তীব্র নেশা চরিতার্থ করার জন্যে অপরের উপর কিভাবে ঝাপিয়ে পড়ে এবং ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়, এ থেকেই সহজে অনুমেয়। যুবক-কিশোরদের দ্বারা এ জাতীয় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড একটি সমাজের চরম অসুস্থতার দিকেই ইঙ্গিত করে। আমাদের সমাজ ও তারই শিকার।

সবকিছু জেনে শুনেও দেহ-আত্মার সম-উন্নতি বিধানকারী শিক্ষানীতি দেশে চালু না করে আমরা নিজেরাই আমাদের নাগরিকদের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত রাখছি এবং নিছক দৈহিক উন্নতির সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে চালু করে তাদেরকে সমাজ বিরোধী, সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, মাদকাসক্ত এমনকি পিতা-মাতার হত্যাকারীরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করছি।

যুবশক্তিকে ধ্বংস নয়, রক্ষা এ প্রসঙ্গে অকুতোভয় মাওলানা কিসমতীর প্রবন্ধ। জাতির চালিকা শক্তি হলো যুব সমাজ। যুব সমাজের ধ্বংস মানেই একটি দেশের ধ্বংস। ৫০-এর দশকের প্রথমার্ধে ভাষা আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে দেশের মানুষের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ সময়, এমনকি তার পরবর্তী সময়েও কোথাও আন্দোলন বা অন্য কোনো কারণে কোনো ছাত্র মারা গেলে, তখন সরকারী ও বিরোধী দলীয় উভয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে

এজন্যে দুঃখ ও শোক প্রকাশ করা হতো। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশে কোনো একজন তরুণ বা যুবক গুলীবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হলে সাধারণভাবে আগে চিন্তা করা হয় যে, যুবক বা তরুণটি কোন দলভূক্ত? সে হিসাবে তার প্রতি নিজের মনোভাব স্থির করা হয়।

খুন হওয়া যুবক সে যে দলেরই হোক, তার পরিচয় যাই থাকুক, দৈনিক খুন, পাল্টা খুনের দ্বারা এভাবে দেশের যুবশক্তি নিঃশেষ হতে থাকবে আর তাদের সংগঠনের নেতারা দল-অঙ্গদলের সেই নিহত যুবকটির জন্যে শোক প্রকাশ, এজন্যে অপরকে অভিযুক্তকরণ, লাশ নিয়ে রাজনৈতিক ময়দান উত্তপ্ত করার মধ্য দিয়ে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্যেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করবেন, এটাই কি এ জটিল সমস্যার একমাত্র সমাধান? এতে তো দিনের দিন হিংসা, প্রতিহিংসা, সন্ত্রাস, পাল্টা সন্ত্রাসের ক্ষেত্রই প্রশস্ত হতে থাকবে।

এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, এর উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের জন্যে যেখানে দেশের মানুষের মধ্যে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমরা পারস্পরিক রাজনৈতিক হীনস্বার্থে অনৈক্যে লিপ্ত হয়ে এখানকার জনজীবনকেই দুর্বিষহ করিনি, নিজেদের অস্তিত্বকেও আজ হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছি। সুতরাং আজ দলমত নির্বিশেষে আমাদের কর্তব্য, অতীত ইতিহাসের সেসব অনৈক্যের পরিণতির কথা স্মরণ করে নিজেদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে বাংলাদেশকে একটি নিরুপদ্রব আবাসস্থলে পরিণত করার লক্ষ্যে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সকল হিংসা-প্রতিহিংসা ভুলে যাওয়া।

সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা প্রেক্ষিত মাওলানা কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চাঃ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাম্রাজ্যবাদী সাদ্দাম হোসেনের আধিপত্যনীতি ইরাকের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের আগ্রাসনের প্রতিবাদ করে সাংবাদিকতা চর্চা করেছেন। তিনি কঠোর ভাষায় সাদ্দাম হোসেনের মার্কিন প্রীতি ও বিশ্বময় পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে লেখনির মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতি আজ দিবালোকের ন্যায় সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে একথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, লোভী সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীদের তাবেদারী এবং তাদের দুরভিসন্ধির অনুকূল অনুসৃত নীতিতে সাদ্দাম যখন রক্ষা পায়নি, অন্য তাঁবেদার মুসলিম শাসকরাও রক্ষা পাবার কথা নয়। এমনিভাবে ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন

আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিশ্বময় সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার ঝড় একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, শাসক এবং জনগণের চিন্তা-চেতনায় আবেগ-বাসনায় রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

জেহাদী চেতনা এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গোটা মুসলিম বিশ্বে চালু করা এজন্যেও জরুরী যে, জাতিসংঘের অনুমতি ছাড়া বর্তমান ইরাক যুদ্ধ যেই পথ দেখিয়ে গেছে, তাতে ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে আক্রান্ত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনযুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর তা করতে হলে প্রতিটি নাগরিককেই সামরিক প্রশিক্ষণ থাকা জরুরী। এভাবে গোটা মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থাকলে কার বাপের সাধ্য এ জাতির কারও গায়ে হাত উঠায়?

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা ও প্রস্তাবসমূহের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের আজ এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা কি সকলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসাথে রুখে দাঁড়ানোর পথ গ্রহণ করবে, না আলাদাভাবে মরবে। আসলে যেকোনোভাবে বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় না বরং মরতে তৈরি থাকলে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে।

মাওলানা কিসমতী আফগান-ইরাক যুদ্ধ থেকে মুসলিম নেতাদের শিক্ষা ও করণীয় বিষয় নিয়ে সাংবাদিকতা চর্চা করেছেন

এ প্রসঙ্গে মাওলানা কিসমতীর বক্তব্য হলো- ইঙ্গ-মার্কিন দুই পরাশক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে ইরাকের উপর অবৈধ হামলা চালিয়ে যেই 'কারবালা'র সৃষ্টি করেছে, নারী-শিশুসহ হাজার হাজার মানুষের রক্তে যেভাবে কারবালা ভূমি বুকে ধারণকারী গোটা ইরাক ভূখণ্ডকে হোসাইনী বংশধরদের রক্তে লালে লাল করে মানবিক সকল মূল্যবোধকে পদদলিত করেছে, নব্য এজীদদের সৃষ্ট এই 'কারবালা' এবং এই গণহত্যাযজ্ঞও মূলতঃ এজীদের অনুরূপ তাদেরই মৃত্যু ঘন্টার আওয়াজ বিশ্ববাসীকে বজ্র নিনাদে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ইরাকে আগ্রাসী শক্তি অন্যায় ও মিথ্যাচারের দ্বারা যেই সফলতা অর্জন করেছে, তার এই সফলতা তাকে অনুরূপ আরও অধিক মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র ও অন্যায় পদক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করবে। পূর্বাপেক্ষা তার গলার স্বর উতলে উঠবে, তার হুমকি-ধমকির মাত্রা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে ইরাকের মতো দেশকে যেই অস্ত্র বলে কাবু করেছে, একই অস্ত্র সে এখন প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের বেলায়ও প্রয়োগ করবে।

প্রসঙ্গক্রমে এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর শাসকদের কথা বলতে হয়, তাদের উপর বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ বিধানকল্পে মহান আল্লাহ দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত করেছে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ইতিবাচক কাজের মধ্য দিয়ে সঠিক ও সুচারুরূপে পালন করার নির্দেশ রয়েছে, তেমনি মানবতার কল্যাণ বিরোধী যেসব অপশক্তি মানুষকে নিজেদের গোলাম বানাবার চক্রান্তে লিপ্ত তাদের হাত থেকেও মানবতাকে রক্ষাকল্পে সক্রিয় হবার আদেশ রয়েছে। সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে বস্তুগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রযুক্তি জ্ঞান ইত্যাদি সকল উপায়ে সচেষ্ট থাকারও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

এই পরিস্তিতি কিছুতেই একই কেন্দ্র বিন্দুতে স্থির থাকবে না। মুসলিম শাসকদের এই বিলাস নিদ্রা থেকে জনতার গর্জনে একদিন অবশ্যই জাগতে হবে। তবে সে সময় আর কতৃত্ব তাদের হাতে থাকবে না। বিশ্বের সাধারণ গণমানুষ তখন একই প্লাট ফরমে সমবেত হয়ে সকল গণদুশমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

জাতিসংঘের প্রতি পশ্চিমাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন বিষয়ে সাংবাদিকতা চর্চার প্রাণ পুরুষ মাওলানা কিসমতীর কঠোর প্রতিবাদ

জাতিসংঘের প্রতি শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের হস্তক্ষেপ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী ষড়যন্ত্র মাওলানা কিসমতী বলেন, ইহুদী প্রভাবিত মার্কিন প্রশাসন জাতিসংঘকে এ যাবত তার কর্মকাণ্ড স্বাধীনভাবে চালাবার পথে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করে আসছে। সে কারণে এই বিশ্বসংস্থা তার প্রতিষ্ঠার সুমহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে স্বাধীন ও সাবলীল গতিতে অগ্রসর হতে না পারায় অনেক আন্তর্জাতিক সমস্যারই সমাধান হতে পারেনি। বিশেষ করে মার্কিন প্রশাসনে চরম মুসলিম বিদ্বেষী ইহুদী প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত থাকায় মুসলিম বিশ্ব কেন্দ্রিক যেসব পুরাতন সমস্যা ছিল, সেগুলো এখনও তথৈবচ অবস্থায়ই রয়ে গেছে। বরং জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়াতে সেগুলোর সাবেক অবস্থানগত পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রও ইতিমধ্যে বহুদূর এগিয়ে গেছে। ফলে ক্ষাজ দীর্ঘ অর্ধ শতাধিক বছর ধরে সেখানে অব্যাহত রক্তপাত ঘটে আসছে। ফিলিস্তীন, কাশ্মীর ও চেচনিয়াসহ আরও যেসব ভূখণ্ডের আগ্রাসী প্রতিবেশী শক্তি সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে, সেগুলোর পরিস্থিতি দিনের দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রে

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈষম্যমূলক প্রভাবে সেখানে জাতিসংঘ কিছুতেই তার গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়ন দ্বারা ঐ সব স্থানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনো ভূমিকাই পালন করছে না বা করতে পারছে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশ বেতারে মাওলানা কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চা

বহু ভাষাবিদ মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী তদানীন্তন পাকিস্তান আমল থেকে রেডিও পরবর্তীতে বাংলাদেশ বেতারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের আরবি ভাষার সংবাদ পাঠক এবং নিউজ কাস্টার ছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ মাওলানা কিসমতীর সাংবাদিকতা চর্চার প্রভাব ও ফল

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর লেখার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে সমাজ ব্যবস্থায়, শিক্ষা ব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং সবচেয়ে বেশি প্রভাব পরে মানুষের চরিত্র গঠন ও ধর্মীয় ব্যবস্থায়। তাঁর সাংবাদিকতা চর্চার নিম্নোক্ত বাস্তব ফলাফলগুলো উল্লেখযোগ্যঃ

নতুন নতুন সাংবাদিক ও লেখক তৈরি করায় মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ষাট বছরের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা চর্চা করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখা পড়ে পাঠক সমাজ আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছে। অনেকেই আবার তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে সাংবাদিকতা ও লেখালেখির ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ, নির্দেশনা ও শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর হাত ধরে সাংবাদিকতা জগতে অনেকের হাতেখড়ি হয়েছে।* তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. একরামুলাহীল কাফী, সাংবাদিক দৈনিক নয়াদিগন্ত।

২. কিসমতারা মৌসুমী, দৈনিক ইনকিলাব।

৩. মাওলানা সিরাজ, কুমিল্লা, সাংবাদিক, সোনার বাংলা।

৪. হাসানুল বান্না, দৈনিক সংগ্রাম।

৫. ইসমাঈল হোসেন দিনাজী, সহ. সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।

৬. সাব্বির উদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষ, কর্ডোভা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, রামপুরা, ঢাকা।

৭. মোসলেহ্ উদ্দীন সা'দী, কবি, লেখক, প্রাবন্ধিক ও বেতার আলোচক।

৮. মহিউদ্দীন আল আকবর, সাংবাদিক।

সাংবাদিকতা চর্চার প্রত্যক্ষ ফল মহিলা মাদ্রাসা

মাওলানা কিসমতী প্রথম ব্যক্তি যিনি মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে এ দেশে কলম ধরেছিলেন। তাঁর লেখনির পরপরই মহিলাদেরকে দ্বীনি আলোকে গড়ে তুলে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ বংশধরকে ভালো মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে বহু মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে মাওলানা কিসমতীর লেখনি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে।

তাঁর কলাম পড়েই কুমিল্লা নাঙ্গলকোটের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী জনাব আরিফুর রহমান মহিলা মাদরাসার নামে ১২০ শতক ভূমি দান করেন। মহিলা মাদরাসার জন্যে তিনি নিজেও তাঁর গ্রামে ১০ শতক ভূমি দান করে গেছেন। তাঁর লেখালেখির এ রকম বহু প্রভাব দেশের বহু স্থানে পড়ে। [১৪]

---

১৪. মোসলেহ উদ্দীন সা'দী, প্রাগুক্ত

সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বাংলাদেশে সুদমুক্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার। এ লক্ষ্যে আলেম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদসহ আরো অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বারোপ করে লেখালেখি করতে থাকে। তাঁরা সভা-সমাবেশ ও ওয়াজ মাহফিলেও এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। তাদের ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবি শুনে অনেকে সে সময় হাসি-তামাশা করে বলেছে ইসলামী ব্যাংক আবার কী?

পরবর্তী সময়ে আরব দেশের কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী শায়খ বাংলাদেশে আসলে বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের নিয়ে রাজধানীর হোটেল পূর্বানীতে এক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরব শায়খদের কাছে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও দাবি তুলে ধরার জন্য অকুতোভয় সাংবাদিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীকে আরবীতে বক্তব্য দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মাওলানা কিসমতী আরবী ভাষাতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরব শায়খদের কুরআন-হাদীসের আলোকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "আমরা একটা কল্যাণমুখী ইসলামী ব্যাংক করতে চাই কিন্তু আমাদের সেই মূলধন নাই। আমাদের পাশে মুশরিক রাষ্ট্র আছে। আপনারা ধনী, এখন আপনারা যদি আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা সক্ষম হবো।"এরপর তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বলেন, "আপনারা ধনী আপনারা যদি আমাদের সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য-সহযোগিতা না করেন তাহলে আমরা আখেরাতে বলবো, আমরা আমাদের ধনী ভাইদের সাহায্য চেয়েছিলাম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য কিন্তু তারা সাহায্য করেননি।" এ বক্তব্য শুনার পর উপস্থিত আরব শায়খরা 'ইয়া আল্লাহ' বলে আওয়াজ তুলেন।[১৫]

১৫.মোসলেহ উদ্দীন সা'দী, ১০.০৩.১৬ তারিখে এ তথ্য দেন।

কিছুদিন পর মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীকে জানানো হয় যে, তিনি যে আরব শায়খদের ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আহ্বান করেছিলেন সেই আহ্বানে তাঁরা সাঁড়া দিয়েছে। আরব শায়খরা ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিকভাবে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। যার ফলশ্রুতিতে ৩০ মার্চ, ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক যাত্রা শুরু করে।[১৬]

নদী ভাঙ্গন রোধে তালগাছ রোপন

মাওলানা কিসমতী রাস্তার দু'ধারে, নদীর দু'পাড়ে কিংবা পুকুরপাড়ে তালসহ বিভিন্ন দেশীয় গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সর্বপ্রথম কলম ধরেন। এতে সে সময় বেশ সাড়া পড়েছিল। নদী ভাঙ্গনরোধে করণীয় সম্পর্কে তিনি তার লেখনির মাধ্যমে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। যা পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জ, যশোর, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন নদী ভাঙ্গন কবল এলাকার মানুষদের রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নানান কার্যক্রম হাতে নেয়।

দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি

তিনি স্থানীয় মসজিদুল ফারুকে তালিমুল কুরআন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর করতেন। তার হাতে বহু বয়স্ক লোক আল-কুরআন সহি শুদ্ধভাবে পড়তে শিখেছেন। তিনি কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের ওপর অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা তুলে ধরতেন। যা উপস্থিত মুসল্লিরা তন্ময় হয়ে শুনতেন এবং ভুল ধারণাগুলো নিজেদের মন থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে পারতেন। তার উদ্ভাবিত সহজ পদ্ধতিতে তাজবীদসহ সহীহ্ কুরআন তিনি শিক্ষা দিতেন এবং দর্‌সে হাদীসে রসূল (সা.) এর সহীহ হাদীস বেশ সহজে মানুষদের তিনি বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

---

১৬. প্রাগুক্ত

ইসলামী বিধান সমূহের প্রচার ও প্রসার লাভ

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতেন। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর দেখানো পথ অনুযায়ী আমলী জিন্দেগীতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিশ্বে কার্যক্রমের পরিচালক বলেন, শেরওয়ানি-টুপি, পায়জামা, জুতোয় সবসময় পরিপাটি পোশাকে আবৃত থাকতেন। মন-মানসিকতায় আমার গোটা জীবনে এরকম পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ হাতেগোনা দেখেছি।[১৭] মাওলানা কিসমতীর ব্যক্তিগত আমলী জীবন দেখে, ইসলামী লেখা পড়ে ও ওয়াজ-নসিহত শুনে অনেক ব্যক্তি ইসলামী জীবনযাপনের প্রয়াস পায়।

---

১৭. ২০.০১.২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ বেতার বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের পরিচালক জনাব কামাল আহমেদ মাওলানা কিসমতীর স্মরণ সভার এ কথা বলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

ইসলামী সাহিত্য ও মাওলানা কিসমতী

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী সাহিত্য ও মাওলানা কিসমতী

পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা ব্যাপক আকারে বর্ধনশীল। ইসলামী আদর্শকে অতিক্রম করে মানব জীবনে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণ করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি মুসলিম আধুনিক গুরুত্বপুর্ণ অঞ্চল এদেশে বসবাসরত জনগণের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান। আরবী ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্যে এ বিশাল জনগণের কি অবদান রয়েছে তা জানা অতীব প্রয়োজন। মুসলমান দ্বারা এদেশ প্রায় সাড়ে ছয় শত বছর শাসিত হয়েছে এবং এর ব্যাপক প্রভাব সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর পড়েছে। আরবী একটি ধর্মীয় ভাষা তাই ধমের তাকিদেই এই ভাষা শিখতে হয়। বাঙালি মুসলিম সাহিত্যকদের অনেকেই বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হয়রত মুহম্মদ (স.) এর হাদীস অনুসরণে সাহিত্য চর্চা করেছেন। আরবী ভাষা আয়ত্ব করে তাঁরা বাংলা ভাষায় সাহিত্য রস দিয়েছেন। বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগে ইসলামী সাহিত্যের উপর তেমন লিখিত বই পুস্তক ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে আমরা ইসলামী সাহিত্যের উপর লিখিত অনেক বই পুস্তক, পুঁথি সাহিত্য, গীতি সাহিত্য, কবিগান দেখতে পাই। এই সময় অনেক সুলতান ও আমীরের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়েছে। সাহিত্য চর্চায় যারা পৃষ্টপোষকতা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুলতান ইলিয়াস শাহ, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ, ফিরোজ শাহ, নুসরাত শাহ, নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ শাহ প্রমূখ। আধুনিক যুগে ইসলামী ভাবধারা নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং বর্তমানেও অনেক সাহিত্যিক ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য রচনা করছেন। মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমত আরবী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় অনেক ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনুসরণীয়।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সাহিত্যের পরিচয়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 'সাহিত্য' শব্দটির সাধারণ অর্থ মিলন। সাহিত্যের ভাব এ অর্থে 'সহিত' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় যোগে এ শব্দটি নির্গত হয়েছে[৫৭]। তাই এর অর্থ হিসেবে বলা যায় সাহিত্য হল সহিতত্ত্ব বা একের সঙ্গে অপরের মিলন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। মানুষ তার ব্যক্তি মন ও সমাজের অবস্থা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। তাই বলা যায় সাহিত্য হল ব্যক্তি মনের অনুভূতির ভাষাগত প্রকাশ। বাংলায় সাহিত্য শব্দটিকে সাহিত্যের বর্তমান অর্থের পরিচয় বাহক হিসেবে পরিগণিত হতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। বাংলায় আজকাল আমরা যে ব্যাপক অর্থে সাহিত্য শব্দটির ব্যবহার করে থাকি প্রাচীন কালের সাহিত্যিকরা সেই ব্যাপক অর্থেই 'কাব্য' শব্দটির ব্যবহার করতেন। আমরা বাংলা ভাষায় 'কাব্য' শব্দটিকে সংস্কৃত ভাষা হতে গ্রহণ করেছি। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য শব্দের ব্যবহার ব্যাপক ও অতি প্রাচীন। তবে পরবর্তী কালে সংস্কৃত ভাষায় কাব্য শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে সাহিত্য শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। আর আধুনিক কালেও সংস্কৃত ভাষায় 'কাব্য' শব্দটিকে স্থানচ্যুত করে সাহিত্য শব্দটি সে স্থান দখল করতে পারে নাই, শুধু কাব্য শব্দের সমার্থক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে[৫৮]।

আরবীতে 'সাহিত্য' শব্দটিকে 'আদব' বলা হয়। এ শব্দটিকে সাহিত্যের বর্তমান অর্থের পরিচয় বাহক হিসেবে রূপান্তরিত ও পরিগণিত হতে দীর্ঘ সময় ও পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। এ শব্দটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে 'লিসানুন আরব' প্রণেতা বলেন- অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে তা, যার মাধ্যমে একজন সাহিত্যিক সব মানুষের মাঝে শিষ্ঠাচার মন্ডিত হয়। এটাকে সাহিত্য বলা হয়েছে এ জন্য যে, এটা মানুষকে সৎগুণের প্রতি আহবান করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর সাহিত্যের মূল হলো, 'ডাকা' বা আহবান করা[৫৯]।

---

[57]সাহিত্যের স্বরূপ, ডা. শশি ভুষণ দাশ গুপ্ত, ঢাকা, বৈশাখী পাবলিকেশন, বাংলা বাজার, ১৯৯২, পৃ-১৪১

[58]প্রাগুক্ত পৃ: ১৪১

[59]লিসান-আল-আরব, ইবন মানজুর, কায়রো দারুল মা আরিফ, তা.বি.

ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা

ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'নাহবা মাজহাবিন ইসলামী ফিল আদাব ওয়ান্নাকদ' নামক গ্রন্থে বল হয়েছে।[৬০] অর্থাৎ জীবন, জগৎ ও মানব সম্পর্কে সাহিত্যিকদের হৃদয়পটে উদ্ভূত প্রভাবের শৈল্পিক ও অর্থপূর্ণ বর্ণনা যা মহান স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা হতে উৎসারিত হয় এবং যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়।

সাহিত্য শব্দটির কয়েক রকম অর্থ হয়। সাহিত্য শব্দটিকে কেউ কেউ সম্মিলন অর্থে ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হচ্ছে মনে মনে ও আত্মায় আত্মায় মিলন। সাহিত্য শব্দটি সহিত থেকে উদ্ভূত। শব্দটির সাথে হিত, কল্যাণ ও মঙ্গল ইত্যাদি ভাব সম্পর্কযুক্ত। সাহিত্য সত্য সুন্দরে আধারিত বলেই সাহিত্যিক সত্যের পূজারি।[৬১]।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী সাহিত্য গবেষক আবদুল মান্নান তালিব বলেন– "হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্য বাইরের কোন কিছু সূক্ষ্মভাবে অনুভব করার পর ব্যক্তি মাত্রই তা প্রকাশের আকাঙ্খা পোষণ করে। সাহিত্যিক হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম অনুভবকে অসম্ভব, রূপক, ছন্দ, ভাষা ও শব্দের কারুকার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন[৬২]। ডা. লুৎফর রহমান তাঁর উন্নত জীবন গ্রন্থে সাহিত্য সম্পর্কে বলেন, " কথা কাগজের ধরে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টির সামনের ধরার নাম সাহিত্য সেবা। এই যে, কথা এই কথা সাধারণ কথা নয় একথার ভিতর দিয়ে জীবনের সন্ধান বলে দেয়া হয় পুন্যের বাণী ও মুখ্যের কথা প্রচার করা হয়। বর্তমান ও অন্তিম সুখের দ্বার মুক্ত করে দেয়া হয়[৬৩]। ভাষা বিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহিত্যের একটা সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন "যেখানে আনন্দহারা আনন্দ পায়, ব্যথিতের ব্যথা জুড়ায়, হতাশের ভরসা জাগে,তাপিত আরাম পায়, দু:খী সুখের খবর শোনে, প্রেমিক স্বর্গের সৌরভ শোকে, সেই সাহিত্য[৬৪]।

---

[60]নাহবা মাজহাবিন ইসলাম ফিল আদাবী ও নাকদ, ড. আব্দুর রহমান রাফাত বাশা, ১৯৮১, পৃ.৬৮

[61]মুহাম্মদ ইসমাইল ইসলামী সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান সমাজ, (কলকাতা: মলিক ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০১) পৃষ্ঠা-৬৭

[62]আব্দুল মান্নান তালিব, ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় প্রকাশ,২০০৭) পৃ: ১৪

[63]উন্নত জীবন, ডা. লুৎফর রহমান, প্রবন্ধ সমগ্র, সম্পা, বেলায়েত হোসেন(দি স্কাই, পাবলিশার্স, জুলাই, ২০১০ পৃ.-৮)

[64]ডক্তর মুহম্মদ শহীদুলাহ "সাহিত্যের রূপ", মোশারফ হোসেন, সম্পা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ-১০১)

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত একটি ধারণা বা পথ হল সাহিত্য। এই সাহিত্য পথকে যে যত সুন্দর করে সৃষ্টি করতে পারবে, সে তত সার্থক ও সফল সাহিত্যিক হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হবে। আর ইসলামী ভাবধারায় যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয় তাই ইসলামী সাহিত্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামী সাহিত্যের সূচনা

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান চতুর্থ[৬৫] যুগ যুগ ধরে এদেশ ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য বহন করে আসছে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই ইসলাম ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার ধারা গড়ে উঠেছে এদেশে।

মুসলিম শাসনামলে সাহিত্য চর্চা

মোগল পূর্ব যুগে যারা আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন, তাঁদের অনেকেই আরবী ভাষায় ইসলামী বই পুস্তক রচনা করেন। এতে আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনার একটি ধারা সৃষ্টি হয়। ছয়শত বছরের অধিক সময় ধরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ফার্সী ছিল (১২০৩-১২৩৭) । স্বভাবতই ফার্সীর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানসিকতার উপর।

১৮৩৭ সালে ফার্সী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হারায় এবং দেশে এর স্থলে বাংলা ও ইংরেজী তার স্থলাভিসিক্ত হয়। বৃটিশ সরকার ফার্সীকে মুসলিম শাসনের প্রতীক মনে করে তা মুছে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং এর স্থলে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বাংলায় উর্দুর পৃষ্ঠ পোষকতা আরম্ভ করে।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই একশ বছরের কাহিনী বাংলার মুসলমানদের জন্য লাঞ্চনা ও বঞ্চনা ভরা এক সুদীর্ঘ তমসাকালের রক্তঝরা কাহিনী। দারিদ্র ও

[65]ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়

বঞ্চনার নাগপাশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরুজ্জীবনের জন্য নিজেদের সভ্যতাকে ধারণ করে বেঁচে থাকার জন্য ও প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরে উজ্জ্বল এক কাহিনী। সে কাহিনীতে আছে মজনু শাহ-তিতুমীর-শরীতুলাহ-দুদুমিয়ার সংগ্রামের কথা আছে শহীদী খুনে ভাসমান অসংখ্য রক্তপদ্মের কথা[৬৬]।

বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা সে সময় সাহিত্য চর্চার কথা খুব একটা চিন্তা করতনা। এ অন্ধকার সময়ে যারা সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তমিজী, মুহাম্মদ চুহর, মালে মোহাম্মদ, বাকের আলী চৌধুরী, মুহম্মদ খাতের, রাহিমুন্নেসা ও হামিদুল্লাহ খান।

ফোর্ট উইয়িলাম কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক 'মঙ্গল সমাচার' নামে বাইবেলের অনুবাদ বাংলা ভাষায় গদ্য সাহিত্যের একটি মাইলফলক হিসেবে ধরা হয়। সে সময় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু লেখকের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ। সে সময় আমরা মুসলিম সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চায় উল্লেখযোগ্যভাবে দেখতে পাই। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, শওকত ওসমান, কায়কোবাদ, মীর মশাররফ হোসেন, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ আবদুর রহিম, শেখ আব্দুস সোবহান, মোহাম্মদ মোজ্জাম্মেল হক, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলুল করিম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মোহাম্মদ নজিবুর রহমান প্রমুখ। কলকাতা ও ঢাকাকে কেন্দ্র করে ইসলামী সাহিত্যক দেয় আবির্ভাব ঘটে তাঁদের হাত ধরেই। মুসলমানরা সাহিত্য চর্চার জন্য এগিয়ে আসেন। সাহিত্য তাঁদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইংরেজ আমলে ইসলামী সাহিত্য চর্চা

[৬৬]. "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান" বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, ডক্টর আসকার ইবনে শাইখ, পৃ-৩৬২।

ইংরেজ আমলে ইসলামী সাহিত্য চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা মাদ্রাসা। যা মুসলমানদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্ব প্রথম সরকারী মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসাই তখন দুটি বিভাগ ছিল আরবী বিভাগ ও ইংরেজী বিভাগ। ১৭৮২ সালে আরবী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮২৯ সালে ইংরেজী বিভাগ চালু হয়[৬৭]।

এই প্রতিষ্ঠানটি সে সময় মুসলমানদের প্রাণ কেন্দ্র ছিল। কারণ বাঙালী মুসলমানদের দ্বীনি শিক্ষার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতিতে ১৮৭৪ সালে বাংলাদেশে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম মাদ্রাসা এবং রাজশাহী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে[৬৮]।

বহু বাধা বিপত্তির পরে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ই আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ' চালু হয়। এ বিভাগের ছাত্র ড. সৈয়দ মু'আযযম হুসাইন পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রথম উপাচার্য। আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্ররা বিভিন্ন কর্মকান্ড ও খেলাধূলায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে সুনাম অর্জন করে। এ বিভাগ থেকে বহু ইসলামি চিন্তাবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সমাজ সেবক সৃষ্টি হয়, যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদান রেখেছেন এবং আজও রাখছেন। ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষায় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যেই সৌদি সরকার ১৯৭৭ সালের মার্চ- এপ্রিল মাসের ৯ দিন ব্যাপি মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন।

বিশিষ্ট আলিম ও ধর্ম প্রচারক মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী ১৯১৫ সালের আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর পার্শ্বে পাহাড় এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৬০০ একর জমি দান হিসেবে পাওয়া যায়। তিনি

[৬৭]. তারিখ-এ মাদ্রাসা-এ আলিয়া, মাওলানা আবদুস সাত্তার, ২য় খন্ড, ১৯৫৯, পৃ:-১০৭-১১৯
[৬৮]. প্রাগুক্ত, পৃ:৭১

জনগণের কাছে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ও পরিকল্পনার কথা বারংবার প্রচার করেন। তাঁর আল-ইসলাম ও 'ছোলতান' পত্রিকায় 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন এবং মাসিক মুহাম্মদীতেও এ সম্পর্কে ধারাবাহিক লেখা প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭ সালের পর বিভিন্ন সময় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এ জন্য অনেক শাহাদত বরণ করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী নিজেও তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করেন। ছাত্র-শিক্ষক ও দেশবাসির আন্দোলনের চাপে সরকার ১৯৬৩-৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সৈয়দ মু'আযযম হুমাইনের নেতৃত্বে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করেন।

১৯৮০ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। ১৯৮২ সালে এক অর্ডিনেন্স দ্বারা এই আইনটি সংশোধিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক এইচ.এম.এরশাদ ১৯৮৩ সালের ২১ শে জুলাই, টঙ্গীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

বৃটিশ পরবর্তী যুগে ইসলামী সাহিত্য চর্চা

দীর্ঘ সময় বৃটিশদের দ্বারা শাসিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয় ঢাকা। সাধারণত রাজধানী থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎকর্ষ সাধিত হয়। রাজধানীর সাথে সবদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল থাকে। তাই ভারত-পাকিস্তান বিভক্তের পর কলকাতা মাদ্রাসার আরবী বিভাগকে ঢাকায় স্থানান্ত রের প্রচেষ্টাই এই প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তা আসবাবপত্র সহ ঢাকায় আসেন। মাদ্রাসাটি সাময়িকভাবে ঢাকায় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে ঢাকা বখশী বাজারে

স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে মাদ্রসাটি সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা নামে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

পরবর্তীতে ইসলামী শিক্ষা প্রচার-প্রসারের জন্য অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন: দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা (চট্টগ্রাম), হুসাইনিয়া আরাবিয়া কওমী মাদ্রসা (সিলেট), দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম কওমী মাদ্রাসা (ফরিদপুর), দারুল উলুম কওমী মাদ্রাসা (কুমিল্লা) আযীযুল উলুম কওমী মাদ্রাসা (চট্টগ্রাম), লালবাগ জামেআ-এ কুরআনিয়া আরাবিয়া কওমী মাদ্রসা (ঢাকা), ফেনী আলিয়া মাদ্রসা, কানাইঘাট দারুল উলুম কওমী মাদ্রাসা (সিলেট) জামেয়া ইসলামিয়া (কিশোরগঞ্জ)–, এ জাজিরা দারুল উলুম কওমী মাদ্রসা (যশোহর) আহসানবাদ ্টাইটেল মাদ্রাসা (বরিশাল) নবাবগঞ্জ (কামিল) আলিযা মাদ্রাসা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) , আরামবাগ আলিয়া মাদ্রাসা (ময়মনসিংহ) সহ আরো অনেক।

আরবী, ফার্স ও উর্দু এ তিন ভাষায় পাকিস্তান আমলে এ দেশে বই পুস্তক রচিত হলেও উর্দুর প্রতি তৎকালীন সরকারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার কারণে ঐ সময় মাদ্রাসা শিক্ষার বাহন ছিল উর্দূ এবং এ ভাষাতেই ইসলামী সাহিত্য রচিত হয় সবচেয়ে বেশি। উর্দূ ভাষায় ইসলামি অনেক গ্রন্থ অনুবাদ হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় বই পুস্তক উর্দুতে অনুদিত হওয়ার কারণে পাঠক সমাজের অনেক উপকার হয়। পবিত্র কুরআন হল মুসলমানদের ধর্মীয গ্রন্থ যাতে প্রত্যেকটি বিষয় মহান আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। উর্দূ ভাষায় মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অনেক তাফসির রচিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ছিল শূন্যের কৌঠায় , সেখান থেকে এদেশের মুসলিম মনীষী বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা জোয়ার সৃষ্টি করেছেন। বাংলা ভাষায় অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এমন কোন শাখা বাকি নেই যে বাংলা ভাষায় বই রচিত হয়নি। ফিকহ বিষয়ক ইসলামী সাহিত্য বাংলা ভাষায় বেশি রচিত হয়েছে এছাড়াও কুরআন, হাদীস, ইসলামী অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু

ইসলাম হল মহান আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্য। ইসলামের প্রচার-প্রসার কোন নির্দিষ্ট এলাকা, দেশ বা ভূ-খন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই যুগের চাহিদানুযায়ী সে তার আকীদা ঠিক রেখে চলে আসছে।

ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিখ্যাত সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তা তুলে ধরা হলঃ

* তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত এ তিনটি হল ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এ তিনটি বিষয়বস্তকে কবিতায়-গল্পে-উপন্যাসে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা সমগ্র পরিবেশকে প্রভাবিত করে। এ জন্য অবশ্যি একজন ইসলামী কবি ও ইসলামী গল্পকারকে তার পরিবেশ ও সমাজ চিন্তার কাঠামোর বিরুদ্ধে সারাক্ষণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হবে। এ মৌলিক বিশ্বাস তিনটিকে একটি বিশ্বজনীন জীবন দর্শনের চিন্তাগত ভিত্তি হিসেবে পেশ করতে হবে। এ তিনটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিবেশের ধারা ও ঘটনার মোড় পরিবর্তন করতে হবে।

  ইসলামী চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলী , ইসলামী কবি ও গল্পকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উপস্থাপনের মাধ্যমে তার মধ্যে সক্রিয় নৈতিক গুণাবলী ও বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন। এ সঙ্গে ইসলামের নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর আলো জ্বালিয়ে সমগ্র সমাজ অংগনকে আলোকিত করবেন।

- প্রথমে দেশের সমাজ ও পরিবেশ এবং পরবর্তী পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক সমাজ ও পরিবেশ। এ ছাড়াও মানসিক ও চিন্তাগত এবং নৈতিক পরিবেশ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথা সব ধরণের পরিবেশ। এসব পরিবেশ আমাদের প্রতিকূল। এদের সাথে আমাদের চিন্তাগত বিরোধ সুস্পষ্ট, কাজেই এই বিরোধী পরিবেশ ও তার কাঠামোয় প্রচন্ড আঘাত হানতে হবে।

- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বর্তমান নারীকে যেখানে স্থাপন করা হয়েছে এবং বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করছে আমরা তা থেকে তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায় স্থাপন করতে এবং ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চাই ।

- পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম । আধুনিক জাহেলিয়াতের এ দুটি সন্তান আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও যে ধ্বংস ডেকে আনছে তার প্রত্যেকটা পর্যায় আমাদের জনগণের সমানে তুলে ধরতে হবে । বিশেষ করে কমিউনিজম বিপ্লব আনার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করছে তার সাথে আমাদের সুস্পষ্ট বিরোধ । ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলমানদের সঠিকভাবে অবহিত করার জন্য আমাদের এ বিষয়বস্তুটি অবলম্বন করতে হবে ।

- দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক সুবিচার । একদিকে যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইসলামী সাহিত্য হবে সোচ্চার তেমনি অন্য দিকে ইসলামের অর্থনৈতিক সুবিচারের দৃষ্টান্ত ও তুলে ধরতে হবে ।

- ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লব । ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠত না হওয়া পর্যন্ত এটিই হবে আমাদের আবেগময় বিষয়বস্তু । ইসলাম একটা আন্দোলন এবং ইসলামী সাহিত্য এ আন্দোলনের ফসল । মুসলামানদের জাগ্রত করার জন্য এ আন্দোলনের মুল চিন্তাধারা ও পদ্ধতি তাদের সামনে তুলে ধরাও এর একটা গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়বস্তু ।

- ইসলামী সাহিত্যিক কোন ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে সাহিত্য রচনা করবে এটা তার নিজস্ব বিষয় । ইসলামের আলোকে যে কোন বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করা যাবে যা সমাজ, দেশ ও জনগণের জন্য কল্যাণকর হবে পরকালের কথা চিন্তা করে সাহিত্য রচনা করা একজন বিবেকবান মুসলিম সাহিত্যেকের দায়িত্ব-কর্তব্য । কুরআন, হাদীস ও ফিকহ এর আলোকে সাহিত্য কর্মকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে হবে । যার মাধ্যমে লেখক ও পাঠক উভয়ই উপকৃত হবে ।

চর্তুথ পরিচ্ছেদঃ ইসলামী সাহিত্যের উদ্দেশ্য

সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের মাঝে এক অভূতপূর্ণ মিল রয়েছে। পাঠকের মনের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারনা, কল্পনা, চাহিদা, আকাঙ্খা ইত্যাদি বিষয় লেখকের লেখনির মাধ্যমে চমৎকার ভাবে ফুটে ওঠে। সাহিত্যের কাজ হল পাঠকের বিভিন্ন চাহিদা পূর্ণ করা। তাই একজন লেখক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে লেখে থাকেন। এটা কোন সময় আনন্দের হয় বা দু:খের হয়। পাঠক জীবনে আনন্দ দেয়া সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য হলেও সাহিত্য শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের কল্যাণে মানবীয় গুণাবলীকে সাহিত্যের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলার মধ্যেই সার্থকতা রয়েছে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন করা। আনন্দ দেয়া কেবল সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। আবার নিছক শিল্পকারিতা বা সাহিত্যের খাতিরে সাহিত্য করাও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের জীবনের প্রতিটি কদমই উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত। ভাল ও কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। সাহিত্যের মধ্যে কল্যাণ না থাকলে তাকে সাহিত্য বলা যায় না। 'মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যবিহীন কোন বিষয় কল্পনা করা যায় না। সে উদ্দেশ্য ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে ছোট হতে পারে, বড়ও হতে পারে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য এমন হতে পারে না যা মানুষের উন্নত রুচিবোধে ব্যাঘাত ঘটে, যে সাহিত্যিক নিছক ব্যক্তিগত ভাব- কল্পনাকে বিচরণ করে, সে প্রসারিত দৃষ্টির অধিকারী নয়। সমগ্র জীবনকে করতলগত করার মত মতাদর্শ থেকে যে বঞ্চিত জীবনের খন্ড খন্ড ঘটনাবলী, মানবিক কার্যক্রম ও খন্ডিত আবেগ- অনুভূতিকে একটি বিশ্বজনীন সত্যের ছাঁচে ঢালাই করার ক্ষমতা যার নেই। সে সমস্ত মানবতা ও তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা অধ্যায়নের ক্ষমতা রাখে না।

এটাই ইসলামের দাবি যে, একজন ইসলামিক সাহিত্যিক তার লেখনির মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিষয়কে পাঠকের কাছে তুলে ধরবেন। তিনি মানুষকে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ দিবেন এবং মন্দ কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত

করবেন। সমাজে বিরাজমান অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত করে মানুষকে কল্যাণকর ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। ইহকালীন ক্ষণস্থায়ী সুখ শান্তি যেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য না হয় তা লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হবে। ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি কীভাবে পাওয়া যাবে সে পথ বাতালিয়ে দিতে হবে। সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি বিষয় ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পরিচালিত করতে হবে। ইসলামী সাহিত্যের লক্ষ্য থাকবে ইসলামী নৈতিকতার আলোকে জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাহিত্য রচনা করা। জীবনের যেমন একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। ইসলামী সাহিত্যেও তেমনি একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলে।

ইসলামী সাহিত্যে ব্যাপকতা আছে, চিন্তা, ও লেখার স্বাধীনতা আছে, অন্য কোন সাহিত্যে এগুলো যে চেহারায় আত্ম প্রকাশ করেছে ইসলামী সাহিত্যে তার অবকাশ নেই। ইসলামের প্রতিটি কাজ হবে মানব জাতির কল্যাণ সাধনার জন্য। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একজন মু'মিন ব্যক্তির কর্তব্য ঠিক তেমনি একজন ইসলামী সাহিত্যিক ও তার লেখা দিয়ে এই সব অধিকার বঞ্চিত নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সমাজের মানুষকে অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে একজন লেখকের সাহিত্য কর্ম জাতিকে জাগিয়ে তুলবে। একজন লেখকই পারে সমাজে মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে। জাতিকে জাগিয়ে তুলতে।

ইসলামী সাহিত্য ইসলামের চিন্তা-চেতনা ও মহিমা সাহিত্যে তুলে ধরবে এটাই কাম্য। এই সাহিত্য মানুষকে ইসলামের জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং উৎসাহ জোগাবে। ইসলামী আদর্শ দেখে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে জীবনকে ধণ্য করবে। ইসলাম সবার কাছে একটি আর্দশিক ধর্ম হবে। যা সমগ্র মানব জাতির জন্য উভয় জগতের কামিয়াবির মাধ্যম হবে।

ইসলাম শুধু মানবের পার্থিব উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের জন্যেই জগতে আসে নাই বরং সমগ্র বিশ্বের মানব জাতিকে মুক্তি ও স্বর্গের পথে লইয়া যাইতেই তাহার আবির্ভাব। সুতরাং ইসলামী সাহিত্য একদিকে যেমন উন্নতি ও কল্যাণের উৎস হইবে, অন্যদিকে

তেমনি মুক্তির ধারা ও সৃষ্টির প্রেরণা বিশ্ব মানবের প্রাণের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া তুলিবে। ইহাই মুসলমান সাহিত্যকের প্রধানতম লক্ষ্য এবং ইহাই তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত। মানব সন্তানকে প্রকৃত মানব রূপে গড়ে তোলায় হচ্ছে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে তাদের জীবনকে রক্ষা করা। বিশেষ করে মুসলমান সমাজকে তার নিজস্ব ধর্মীয় কৃষ্টি কালচার সজাগ করে দেয়। যে এই সংস্কৃতি বহন করে সে প্রকৃত ও আদর্শ মানুষ হওয়ার সুযোগ পাবে। হতাশাগ্রস্থ মুসলমান জাতির মধ্যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম। আমাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কালচারে ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল। সাহিত্যের আসল কাজ সম্পর্কে শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী বলেন, সাহিত্যের কাজ কেবল লোক চিত্ত বিনোদন নয়, ভাঁড়ের ভাড়ামীর মত হাস্যরহস্য বা রস রঙ্গ সৃষ্টি করাও নয় অথবা চিত্রকরের সচিত্র অংকের ন্যায় মানব মনকে সৌন্দর্য রসে ডুবিয়ে রাখাও নয়। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা তার অন্তর জ্ঞানের আগুন জ্বালিয়ে তার ভীরুতা, জড়তা ও মুখর্তার আবর্জনা পুড়িয়ে দেয়া এবং তৎপরিবর্তে সৎসাহস, কর্মস্পৃহা ও দেশাত্মবোধ উদ্দীপ্ত করা। সাহিত্য সৃষ্টি উদ্দেশ্য বিহীন নয়। সাহিত্য জীবনেরই বিশ্লেষণ । ধর্ম সেই জীবনকেই ধারণ করে আছে। কাজে ধর্মও সাহিত্যের অর্ন্তভুক্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

যে সাহিত্যিক তার নিজ জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে এবং তার লেখার মাধ্যমে ইসলামী ভাবধার ফুটে ওঠে তিনিই প্রকৃত ইসলামী সাহিত্যিক। ইসলামী সাহিত্য রচনার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা ও বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। একটি সমাজের সংস্কৃতি সেই সমাজকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। সেই পরিবর্তন ভাল হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। মুসলিম সমাজে অপসংস্কৃতি তথা ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলমানের উপন্যাস ও নাটকে একটা মুসলমানি ছাপ থাকা চাই। নচেৎ জাতীয় জীবনের জন্য সে উপন্যাস ও সে নাটক বৃথা। কাব্য ও খন্ড কবিতারও ইসলামিক ভাব থাকা চাই। কাব্য এমন হইবে, কবিতা এমন হইবে, যাহা পাঠে মুসলমান খাঁটি মুসলমান হতে পারে।

ইসলামের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ইসলামী সাহিত্য রচিত হবে। লেখনির মাধ্যমে মুসলমানদের গৌরব গাঁথা ইতিহাসকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে। পাঠককে ইসলামী ভাবধারার বিভিন্ন বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহাসিক ভূমিকা ইত্যাদি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মুসলিম যুবক সমপ্রদায় ও অমুসলিমদের নিকট প্রচার করতে হবে। মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়েই সাহিত্য রচিত হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের ছাপ থাকতে হবে। তা না হলে ইসলামী সাহিত্য হবে না। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবদুর রহীম বলেনঃ "ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও খন্ডাকারে যাপিত হওয়ার কোন অবকাশই ইসলামী পদ্ধতিতে স্বীকৃত নয়। আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগীতে ইসলামী রীতি পালন, কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় তাকে অস্বীকার করার এক বিন্দু অনুমতি নেই এ জীবন পদ্ধতিতে । যে সাহিত্য মানুষকে আর্দশহীন, চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ বানায়, তার ফসল ফলানো দূরের কথা, তার চাষ করাও এখানে সম্ভব নয়, তার প্রকাশ ও প্রচলনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা।

পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইসলামী কবি সাহিত্যিক সম্পর্কে চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উলেখ করা হয়েছেঃ

প্রথমতঃ তারা হচেছ মুমিন অর্থাৎ আলাহ্, তাঁর রাসুল, তাঁর আসমানী কিতাবসমূহ তাঁর ফেরেশতা, পরকাল, ভাল-মন্দ এবং কিয়ামতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে ।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা হবে সৎকর্মশীল । কর্মজীবনে তাঁরা হবে সৎ । অসৎ পন্থা তাঁরা গ্রহণ করতে পারবে না । নীতি নৈতিকতা বর্হিভূত কোন কাজ তাঁদের দ্বারা হবে না ।

তৃতীয়তঃ তাঁরা সবসময় আলাহ্কে স্মরণ করবেন । অর্থাৎ তাঁরা হবেন তাকওয়ার অধিকারী । সকল অবস্থায় তাঁদের মাঝে আল্লাহ ভীতি থাকবে । পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা থেকে নিজেদের বিরত রাখবে । আখেরাতের কল্যাণই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ।

চতুর্থতঃ জুলুম-নির্যাতনের বিপক্ষে অবস্থান । ব্যক্তিগত জীবনের কোন অবস্থায় তাঁরা অত্যাচার নির্যাতনকে প্রশ্রয় দেবে না । সর্বদা তাঁরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে । সমাজ থেকে সকল অন্যায়-অনাচার দূর করার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করবে ।

এছাড়াও ইসলামী সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় যা মানব সমাজে ইসলামী সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা প্রশংসিত মাত্রায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে । মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী ইসলামী সাহিত্যের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ-

- ইসলামী সাহিত্য এমন এক সাহিত্য যে সাহিত্যে অনর্থক কথা, অশ্লীল বক্তব্য, মিথ্যা তোহমাত, অপবাদমূলক বক্তব্য উপস্থাপন পরিহার করা হয় । আর প্রয়োজনীয়, শালীন, গঠনমূলক, বাস্তবসম্মত সত্য তথ্য ও বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় ।
- পাশ্চাত্ত্যের লেখক ও চিন্তাবিদদের থেকে অবগত ইসলামী চিন্তা, চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক সাহিত্য চেতনাকে পরিবর্তন করে ইসলামী চিন্তা চেতনা, ধ্যাণধারণা, কথাবার্তা ও সাহিত্যের বিষয়গুলো ইসলামের আলোকে রূপান্তরিত করে আদর্শবাদী সুশিল সমাজ বিণির্মানের প্রেরণাদায়ক উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করা ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ইসলামী সাহিত্যিক ও ইসলামী গ্রন্থ

যুগে যুগে অসংখ্য ইসলামী সাহিত্যিকগণ ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকের নাম-পরিচিতি সংগ্রহে না থাকার কারণে ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁরা হারিয়ে যাচ্ছেন কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে অগনিত মনীষী এক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ইসলামী সাহিত্যিকের নাম ও তাঁদের গ্রন্থের তালিকা নিম্নে তুলে ধরার প্রয়াস করছি।

১। **ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)**

তিনি নরসিংদী জেলা পাঁচদোনা গ্রামে ১৯৩৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর অনূদিত লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও মিশকাত শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদ। এছাড়াও তিনি আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন, তাপস মালা, মহাপুরুষ চরিত, নীতিমালা ইত্যাদি।

৩। **মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১):**

গ্রন্থ: বিষাদ সিন্ধু, মদিনার গৌরব, মৌলুদ শরীফ, হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ, মোসলেম বীরত্ব, হযরত ইউসুফ, বিবি খোদেজার বিবাহ প্রমুখ।

৪। **শেখ আবদুল জব্বার : (১৮৮১-১৯১৮)**

গ্রন্থ: নূরজাহান, আদর্শ রমনী, মক্কা শরীফের ইতিহাস, গাজী, ইসলামী সঙ্গীত ইত্যাদি।

৪। **মুহাম্মদ নজিবুর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩):**

গ্রন্থ: আনোয়ারা, দুনিয়া আর চাই না, মেহের উননেসা ও গরিবের মেয়ে ইত্যাদি।

৫। **খান বাহাদুর তসলীমুদ্দিন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭)**

গ্রন্থ: কোরআন (৩ খন্ডে), সাহাবিয়া, আমপারা, প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা, সম্রাট পয়গম্বর ইত্যাদি ।

৬। **সৈয়দ আবুল হোসেন(১৮৬২-১৯৩০)**

গ্রন্থঃ স্পেনে মুসলিম পতাকা, জ্ঞান ভান্ডার, মোসলেম পতাকা, জীবন্ত-পুতুল ইত্যাদি ।

৭। **সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১):**

গ্রন্থ: স্পেন বিজয় কাব্য, অনল প্রবাহ, স্বজাতি প্রেম, তুরস্ক ভ্রমণ, ফিরোজা বেগম, রায়নন্দিনী ইত্যাদি ।

৮। **শেখ আবদুল রহীম(১৮৫৯-১৯৩১)**

গ্রন্থ: কোরআন ও হাদীসের উপদেশাবলী, ইসলাম নীতি, নামাজ শিক্ষা, হজ্জবিধি, ইসলামের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি ।

৯। **ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬):**

গ্রন্থ: মানব জীবন, মহাজীবন, মহৎ জীবন, উচ্চ জীবন, সত্য জীবন, ধর্ম জীবন, ছেলেদের কারবালা, বাসর উপহার, পথহারা , যুবজীবন ইত্যাদি ।

১০। **মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী**

গ্রন্থ: কোরআনে স্বাধীনতার বাণী, সমাজ সংস্কার, ভারতে ইসলাম প্রচার, খাজা, নেজামুদ্দিন আওলিয়া, ভারতে মুসলমান সভ্যতা, ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান ইত্যাদি ।

১১। **মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী:(১৮৮৭-১৯৪০):**

গ্রন্থ: মানব মুকুট, নূরনবী, শান্তি ধারা, ধর্মের কাহিনী ইত্যাদি ।

১২। **শেখ ফজলুল করিম (১৮৮৩-১৯৩৬):**

গ্রন্থ: বিবি ফাতেমার জীবনী, বিবি রহিমা, বিবি খোদেজার জীবনী, মোহাম্মদ চরিত্র, হযরত আবদুল কাদের জিলানীর জীবনী, হযরত রব্বানী সাহেবের জীবনী আফগানিস্তানের ইতিহাস, হাতেম তাই ইত্যাদি ।

১৩। **মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩):**

গ্রন্থ: হযরত মোহাম্মদ, ইসলামী সংগীত, হাতেম তাই, মাওলানা পরিচয়, তাপস জীবনী, জোহরা ইত্যাদি ।

১৪। **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২):**

গ্রন্থ: অবরোধবাসিনী,পদ্মরাগ, মতিচুর, সূলতানার স্বপ্ন ।

১৫। **মুহাম্মদ সেরাজুল হক (১৯০৩-১৯৬৩):**

গ্রন্থ: ইসলামের বৈশিষ্ট্য , মোসলেম সমস্যা, সিরাজী চরিত্র, শেরেক ধ্বংস ও ঈমান রক্ষা ।

১৬। **এস. ওয়াজেদ আলী(১৮৯০-১৯৫১) :**

গ্রন্থ: ভবিষ্যতের বাঙালী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, গ্রানাডার শেষ বীর, ইকবালের পয়গম, মাশুকের দরবার, ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, আকবরের রাষ্ট্র সাধনা, ইবনে খালদুনের সমাজ বিজ্ঞান, দরবেশের দোয়া ইত্যাদি ।

১৭। **মুহাম্মদ আবদুল হাকিম(১৮৭৬-১৯৫৭):**

তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের অনুবাদ করেন। তাছাড়া ফিকাহ বিষয়ক গ্রন্থ সরহে বেকায়া এর অনুবাদ করেন ।

১৮। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪):

গ্রন্থ, মরু ভাস্কর, ছোটদের হযরত মোহাম্মদ, মহামানুষ মুহসিন, নওয়াব আবদুল লতিফ ইত্যাদি ।

১৯. কাজী আকরাম হোসেন (১৮৯৩-১৯৬৩)

গ্রন্থ: ইসলামী কাহিনী, মসনবী, ইসলামের ইতিকথা, নওরোজ, কারীমা ইত্যাদি

২০. খান বাহাদুর আবদুর রহমান (১৮৮৯-১৯৬৪)

গ্রন্থ: কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, সহীহ বুখারী শরীফ, ইসলাম পরিচিতি, শেষনবী, মোসলেম নারী, নয়া খুৎবা ইত্যাদি ।

২১. গোলাম মোস্তাফা (১৮৯০-১৯৬৪)

গ্রন্থ: বিশ্ব নবী , মরু দুলাল, ইসলাম, খোশরোজ, বণি আদম, কালামে ইকবাল, রূপের নেশা, বুলবুলিস্তান, রক্তরাগ, হযরত আবু বকর ইত্যাদি ।

২২. বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)

গ্রন্থ: আমার দেখা তুরস্ক, শিশুর শিক্ষা, পূন্যময় ফুল বাগিচা, বেগম মহল ইত্যাদি ।

২৩. মাওলানা আকরাম খান(১৮৬৮-১৯৬৮)

গ্রন্থ: মোস্তাফা চরিত, উম্মুল কেতাব, কোরআন শরীফের অনুবাদ, তাফসীরুল কোরআন , মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ইসলাম মিশন, সমস্যাও সমাধান, বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রীস্টান, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ইত্যাদি ।

২৪. কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)

গ্রন্থ: পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও হযরত মুহাম্মদ ও ইসলাম ।

২৫. **মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) (১৮৯৮-১৯৬৯)**

গ্রন্থ: মানুষের পরিচয়, আলাহ্‌র পরিচয়, অসৎ আলেম ও পীর, হালাল ও হারাম, নেতার কর্তব্য, সংক্ষেপে ইসলামী জিন্দেগী, খেদমতে খালাক বা দু:স্থ মানবতার সেবা, মাতৃজাতির মর্যাদা, বেদআত ও ইজতেহাদ, আজল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ, মুক্তির পথ, তাফসীরুল কুরআন, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, জনসেবা, প্রশ্ন উত্তরে তাসাউফ, এই জামনায় ইসলামী নেজাম সম্ভব নয় কি? ইত্যাদি ।

২৬। **মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)**

গ্রন্থ: নবী গৃহ সংবাদ, কারবালাও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত, পারস্য প্রতিভা, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা, হযরত ওসমান ইত্যাদি ।

২৭। **ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ্‌ (১৮৮৫-১৯৬৯)**

গ্রন্থ: কুরআন শরীফ, ইসলামী বিশ্বকোষ, শেষ নবীর সন্ধানে, তাজরিদুল বুখারী, রোযা, ঈদ ও ফিৎরা, নবী করীম হযরত মুহম্মদ (স.) ছোটদের রাসুলাহ্‌ (স.), অমরকাব্য দিওয়ান ই-হাফিয, রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম, প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী ।

Hundreds saying of the Holy prophet, Tales from the Qurn, Essays on lslam, Pearls from the Holy Prophet

২৮। **প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)**

গ্রন্থ: কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র, ইসলামের মর্মকথা, নূর মহল, আরব জাতির ইতিকথা ।

২৯। **কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)**

গ্রন্থ: ইসলামী কবিতা, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, ওমর ফারুক, কাব্যে আমপরা, মরু ভাস্কর ইত্যাদি ।

৩০। **আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)**

গ্রন্থ: সত্যমিথ্যা, ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া, মুসলমানী কথা ইত্যাদি ।

৩১। **ডক্টর এম. আবদুল কাদের (১৯০৮-১৯৮৪)**

গ্রন্থ: স্পেনের ইতিহাস, মোসলেম কীর্তি, সোলতান সালাউদ্দিন, ইসলামের নীতি, হায়দার আলী ইত্যাদি ।

গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি ইসলামী বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকায় ও সাময়ীকি প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। মুসলমানদের সম্পাদিত পত্রিকা হল; আল-ইসলাম, সাধনা, ধুমকেতু, নবনূর, সওগত, কোহিনূর, মাসিক মোহাম্মদী, নওরোজ, মোসলেম দর্পন, ইনকিলাব, সংগ্রাম, নয়াদিগন্ত, তবলীগ, ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় ইসলামী বিষয় নিয়ে নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছাপানো হয় ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: মাওলানা কিসমতী রচিত ইসলামী সাহিত্য

তিনি ছিলেন একাধারে একজন লেখক, সাংবাদিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী সাহিত্যিক

ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি কলম ধরেছেন। পাঠক সমাজের কাছে কুরআন ও হাদীসের

আলোকে তিনি বিভিন্ন বিষয় সহজ ও সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। মাওলানা কিসমতীর

ইসলামী সাহিত্যের প্রকারভেদ:

১. ইসলামী ভাবধারা বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্য;

২. ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ

১. ইসলামী ভাবধারা বিষয়ক প্রবন্ধ সাহিত্যঃ

ইসলামী ভাবধারার প্রবন্ধ সাহিত্যে একজন মুসলিমের আত্মিক ও বৈষয়িক সম্পর্কের প্রতিফলনসহ আত্মা ও বস্তুর অনিবার্য ঐক্যকে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করার এক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ইসলামী ধারার প্রাবন্ধিক স্বীয় প্রবন্ধকে নিরেট উপদেশ ও নির্দেশনায় পরিনত না করে বরং একে নান্দনিকতার সংস্পর্শে হৃদয়গ্রাহী করাসহ ইসলামের শিক্ষা-দর্শন উপস্থাপনে প্রয়াসী হন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি বাংলা ও আরবী ভাষায় বিভিন্ন স্থানে প্রবন্ধ উপস্থাপনও করেছেন। তিনি পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ লিখে মুসলিম সমাজে ইসলামী ভাবধারাকে সমগ্র জাতির কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা কিসমতীর কয়েকটি লেখা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

মাদ্রাসা-শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সুস্পষ্ট থাকা কর্তব্য। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের জীবনের যেই উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরও থাকতে হবে সেই অভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আর এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র তাদের সম্মানিত শিক্ষকদেরই। এই লক্ষ্য কোনো মদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীর কাছে অস্পষ্ট থাকলে তার পক্ষে কিছুতেই মনোন্নত আলেম- তথা খাঁটি ধর্মীয় শিক্ষিত ও যথার্থ জ্ঞানী হয়ে গড়ে উঠা সম্ভব নয়। আমরা মনে করি বরং এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মাদ্রাসা শিক্ষায় পরীক্ষা ক্ষেত্রে যেসব ছাত্র-ছাত্রী অন্য ধারার শিক্ষার্থীদের অনুরূপ অবৈধ পন্থায় পরীক্ষা পাস করতে চায়, তারা মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে বহুদূরে অবস্থান করাতেই এই অন্যায় করতে পারছে। তেমনি যেসব শিক্ষক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকল সরবরাহ করা কিংবা তাদেরকে নকলের সুযোগ দানের অভিযোগ উঠেছে, তারাও এই মহান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তার শিক্ষাদানের মর্যাদার ব্যাপারে চরম বিভ্রান্ত বলেই আমরা মনে করি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ অন্যান্য অর্থকরী শিক্ষার মতো যারা মনে করে, তারাই শুধু নির্লজ্জের মতো পরীক্ষায় এহেন অনৈতিকতার আশ্রয় নিতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য বিরোধী ভাবধারা নিয়ে যেমন সঠিকভাবে এ শিক্ষা আয়ত্তে আনা যায় না, তেমনি একই কারণে সংশ্লিষ্টদের চরিত্রও এ শিক্ষার দাবী মোতাবেক গড়ে উঠে না। আদর্শবান, আল্লাহভক্ত, যোগ্য শিক্ষকই এই মানদণ্ডে মাদ্রাসায় যথার্থ আলেম গড়ে তুলতে সক্ষম। এই মাপের শিক্ষকবৃন্দের দ্বারাই যেমন এ শিক্ষার মান বাড়তে পারে তেমনি তাদের

হাতেই গড়ে উঠতে পারে আদর্শ ছাত্র, যারা কর্মজীবনে সমাজ অংগনের সকল স্তরে "আল্লাহর খলীফা" হিসেবে যথার্থ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম। বলাবাহুল্য, মাদ্রাসার পরীক্ষায় যেসব শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নকল সরবরাহ করেন কিংবা এজন্যে সুযোগ দিয়ে থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে কোনো যথার্থ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের আসনে বসার যোগ্য নন। তাদের দ্বারা যেমন মাদ্রাসা শিক্ষারও মান বাড়তে পারে না, তেমনি তাদের হাতে এ শিক্ষা সুউচ্চ লক্ষাভিসারী যোগ্য আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গড়ে ওঠাও অসম্ভব।এদেশের জাতীয় ও সাধারণ শিক্ষাঙ্গনে আজ শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিরোধী যেই অশুভ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেই প্রবণতার অভিশাপ থেকে আমাদের জাতীয় শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হলে জাতির সামনে আজ শিক্ষা সম্পর্কীয় যেই আদর্শ স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, সমাজ নেতৃত্বকে সেই মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। গোটা জাতিকে তার মনযিলে মাকসুদের দিকে নিয়ে যেতে হলে যেই যোগ্য ও আদর্শ শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তোলা জরুরী হয়ে পড়েছে, সেই কাঙ্ক্ষিত শ্রেণীটি এ দেশের মাদ্রাসা থেকেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এটি তখনই সম্ভব যদি মাদ্রাসা শিক্ষা, এ শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদেরকে আমরা তার যথার্থ লক্ষ্যাভিসারী করে গড়ে তুলতে পারি। দেশের মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয় এই লক্ষ্য পূরণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছাত্র-শিক্ষকরা দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে এলে এ শিক্ষায় সকলের ন্যায় অবাঞ্ছিত কোনো কিছুই স্থান পাবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ইংরেজ শাসিত অবিভক্ত ভারতে তাদের শাসনের একশ' বছরের মাথায় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার সশস্ত্র বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা ছিল মুসলিম সিপাহীদের যার নেপথ্যে ও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে অনেক মুজাহিদসহ দেশের আলেম সমাজই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। '৫৭'র বিপ্লবকে চরম জুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে ইংরেজরা দমনে সফলকাম হবার পরম চিন্তা করলো যে, দীর্ঘ ১শ' বছর শাসন করার পরও ভারতের এককালের শাসকজাতি মুসলমান ও তাদের সহযোগীদের ইংরেজ বিরোধী দমন করা যায়নি। সুতরাং এখানে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে ভারতের জনগণ বিশেষ করে মুসলমানরা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও জীবনধারার অনুসারী হয়ে গড়ে উঠে এবং নিজেদের ইসলামী স্বকীয় চেতনা ও মূল্যবোধ থেকে সরে আসে।

এই লক্ষ্যে তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রমূলক যেই শিক্ষা দর্শনটি চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । বাস্তবেও তাই হয়েছে। তখন সেই বিপর্যয়ের দিনে বৈষয়িক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মুসলিম ধর্মীয় নের্তৃবৃন্দ ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে মাদ্রাসাসমূহ চালু করেন, উপমহাদেশের দেশসমূহে যেগুলোর অবদান চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং থাকবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু হালে সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমের পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদের যেই ধুর্তামিপূর্ণ আগ্রাসন শুরু হয়েছে, এই আগ্রাসী শক্তি আফগানিস্তান-ইরাক ধ্বংস ও দখল করেই শুধু ক্ষান্ত হচ্ছে না, অতীতের মতোই তারা মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বস্তুবাদী ও ইসলামী প্রভাবমুক্ত করার ষড়যন্ত্র নিয়ে এবার মাঠে নেমেছে। তবে এবারের ষড়যন্ত্র হচ্ছে গোটা মুসলিম বিশ্বকেন্দ্রিক। তাদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতো বটেই এমনকি জনগণের চাঁদা ও যাকাত-সাদকার অর্থে পরিচালিত বেসরকারি কওমী মাদ্রাসা-মক্তবও ছাড়া পাচ্ছে না। শুধু মুসলিম দেশগুলোই নয়, অমুসলিম দেশগুলোর সংখ্যালঘু মুসলমানদের মাদ্রাসাসমূহও এ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না।

ভারত ও বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি বলেন, যেই মুহূর্তে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। ঠিক একই সময় ভারতের মাদ্রাসা বিরোধী অভিন্ন ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে। ভারতের ক্ষমতাসীন উগ্র সাম্প্রদায়িক বিজেপি তার মুসলিম বিরোধী নীল নকশার অংশ হিসাবে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপনের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়। এর সূচনা হয়েছে মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উত্তর প্রদেশ থেকে। রাজধানী নয়া দিল্লীসহ ভারতের সর্বত্র মুসলমানরা কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার এর এহেন অসৎ উদ্যোগের প্রতিবাদে রাজধানী দিল্লীসহ সারা ভারতে মুসলমানদের বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে প্রকাশ।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এটি মসজিদ মাদ্রাসার দেশ। এখানকার লাখো মসজিদে পাঁচবেলা লাখো কণ্ঠে আল্লাহর লা শারীক সত্ত্বার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের বাণী উচ্চারিত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এখানকার মাদ্রাসাসমূহে লাখ লাখ ছাত্র লেখাপড়া করে। এসব মাদ্রাসাকে যুগোপযোগী করায় ছাত্র সংখ্যা আরও বাড়ছে। এখানকার রাজনীতি করা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ন্যায় একটি ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের অনুসারী হতে পারে না। মাদ্রাসা বন্ধের বিষয়টি তো এখানে

কল্পনাও করা যায় না ।এসব বক্তব্য এবং ভারতে মাদ্রাসা মসজিদ বিরোধী অভিযানের উদ্যোগের পরেও যদি বাংলাদেশের মুসলমানদের চৈতন্য উদয় না হয় যে, দেশটিকে এক শ্রেণীর লোক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, পলাশী যুগে মীর জাফর আলী, উর্মিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায় দূর্লভ প্রমুখ গাদ্দারদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নকালে তৎকালীন সাধারণ মুসলমানদের নীরবতা তাদেরকে যেভাবে দু'শ বছর যাবত পথের ভিক্ষারী করে রেখেছিল, তদ্রুপ আজকের বাংলাদেশী মুসলমানরা দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামের বিরোধীতায় নীরব থাকলে তাদেরকেও একই বরং এর চাইতে কঠিন পরিণতির জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হবে । এ নীরবতা তাদের বংশধরদেরকে বানাতে পারে ব্রাহ্মণ্যবাদের গোলাম, যা থেকে শত শত বছরেও মুক্তির আশা করা কঠিন । সুতরাং সাবধান বাংলার মুসলমান!

মাওলানা কিসমতী নারীদের শিক্ষা, কর্ম ও নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো:

চাকরিক্ষেত্র হোক বা অন্যত্র, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজের অন্ধানুসরণে মুসলিম-অমুসলিম সমাজে কেউ তেমন প্রকৃত শান্তির মুখ দেখেনি । কেননা, ইসলাম একটি প্রকৃতি সম্মত ধর্ম । ইসলামী বিধান ও মূল্যবোধবিরোধী জীবনাচার গ্রহণ মূলতঃ প্রকৃতি বিরোধী কাজ করা, যাতে কিছুতেই সফলকাম হওয়া যায় না । প্রকৃতিরই দাবী হলো, যেসব নারীর জীবনোপকরণের অপর কোন পথ নেই, সেসব নারীর কর্মস্থল ও কর্মপরিমণ্ডল এমন হওয়া উচিত, যাতে তাদের সকল প্রকার অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত থাকে । এ কারণেই এই ব্যবস্থাকে ইসলামে অপরিহার্য করা হয়েছে । কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ প্রকৃতিবিরোধী এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শুধু নিজেদের সমাজেরই সর্বনাশ করেনি, তাদের দীর্ঘদিনের প্রভাব বলয়ের অন্যান্য সমাজেরও ক্ষতি করেছে । এখন তাদের মধ্যেই যেখানে এর ক্ষতিকর দিকটি আপত্তিকর মনে হচ্ছে এবং এসবকে অপরাধ গণ্য করে এর শাস্তি দাবী করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তো মুসলিম সমাজের এ ব্যাপারে আরও দ্রুত এগিয়ে আসা উচিত । তেমনি প্রসঙ্গত বলতে হয়, পাশ্চাত্য সমাজের নারীরা পর্যন্ত যেখানে নারী সম্ভ্রম বিনষ্টে প্রতিবাদ ও তা রক্ষায় স্বোচ্চার, সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের নারী সংগঠনগুলোকে এ ব্যাপারে সে তুলনায় নিজেদের স্বকীয়তা, জীবানদর্শ ও ধর্মীয়মূল্যবোধ রক্ষায় সক্রিয় ও স্বোচ্চার দেখা যায় না । তারা নারী অধিকার নিয়ে কখনও স্বোচ্চার হলেও সেখানে আপন স্বকীয়তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার দিকটি অনেক ক্ষেত্রেই

গৌণ থাকে। তাদের এটা জানা উচিত যে, মুসলিম নারীরা নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখেই ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

আজকের মুসলিম নারী সমাজকে জীবনের বাস্তবতার দাবী পূরণ করতে গেলে পশ্চিমের ভোগবাদী জীবন দর্শনের অনুসারী হতে হবে- এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে হবে। যা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এক শ্রেণীর তথাকথিত আধুনিকা প্রগতিবাদী মহিলারা পেশ করেন। বরং নিজস্ব স্বকীয়তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করেই যে জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কঠোর বাস্তবতার মোকাবেলা করা যায়, সেই দৃষ্টান্তই তাওহিদী জনতার এই দেশের নারীদের স্থাপন করতে হবে।

ইসলাম বিরোধী অপসংস্কৃতি সম্পর্কে মাওলানা কিসমতীর প্রবন্ধে নিম্নোলিখিত বিষয়গুলো ফুঠে উঠেছে, নদর বিন হারিসের ন্যায় আল্লাহ রাসূলের ঘোরতর দুশমনই সর্বপ্রথম বিকৃত চরিত্রের নর্তক-নর্তকী ও গায়িকাদের দ্বারা আল্লাহর দ্বীন থেকে মুসলমানদের বিপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নবগঠিত সমাজের ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হয়েছিলো। অশ্লীল নাচ-গান ও মদ-জুয়ার আসর জমিয়ে মুসলিম যুব মানসের বিকৃতি ও তাদের চরিত্র হননের সে উদ্যোগ নেয়। ইসলামের সাফল্যকে দাবিয়ে রাখা এবং তার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পরই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি মুসলিম যুবকদের আকর্ষণ বিনষ্টের জন্যে নদর বিন হারিস এমনটি করেছিল। সে যেই পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রচার করতো ইসলামের দুশমনদের সেই একই ষড়যন্ত্র একই লক্ষ্যে এখনও যে সক্রিয়, মুসলিম সমাজ নেতৃত্বের অনেকে এখনও তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ বলেই মনে হয়।

মহানবী (সা.) এর মিরাজ সফর শেষে প্রত্যাগমনের পর তাঁর প্রদত্ত এক হাদীস দিয়েই আজকের লেখা সমাপ্ত করছি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এরশাদ করেছেন, আমি মিরাজে গিয়ে দেখেছি, অশ্লীল গানের গায়িকা ও নর্তক-নর্তকীদের চেহারা সম্পূর্ণ কালিমাযুক্ত। তাদের গালে আগুনের মালা আর তাদের বস্ত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। আর ফেরেশতারা তাদের শাস্তি দান ও ভৎসনা করে চলেছে। মনে রেখো, সকল মানবীয় গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দানের জন্যেই আমি আবির্ভূত হয়েছি। অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিধ্বংসী নৃত্য সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র ধ্বংসের জন্যেই আমার আবির্ভাব।

ইসলামী বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবন্ধের শিরোনাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"মাদ্রাসা শিক্ষায়ও নকল" এবং কিছু কথা	[প্রকাশ ঃ ১২. ৬. '৯৮]
তালিবান সরকারের কতিপয় ঘোষণা	[প্রকাশ ঃ ১৭. ৭. '৯৮]
নতুন বসনিয়া কসোভো সমস্যা কোন পথে?	[প্রকাশ ঃ ২. ৮. '৯৮ইং]
আত্মরক্ষা, স্বাধিকারের সংগ্রাম ও সন্ত্রাস	[প্রকাশ ঃ ৩১. ৮. '৯৮ইং]
সামূদ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের পরও কি ইরাক বিরোধী যুদ্ধোন্মাদনা থামবে?	[প্রকাশ ঃ ৫. ৩. ২০০৩ইং]
জাতীয় ঐক্যে ফাটল ও তার সুফল ভণ্ডুলের অপচেষ্টা চলছে	[প্রকাশ ঃ ১৩. ৩. ২০০৩ইং]
হত্যা পাল্টা হত্যার এই ধারাবাহিকতা কি থামবে না?	[প্রকাশ ঃ ১২. ২. ২০০৪ইং]
মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র	[প্রকাশ ঃ ২০০৪ইং]
সুধী-বুদ্ধিজীবীদের একটি হুঁশিয়ারি	[প্রকাশ ঃ ১৮. ৯. ২০০৪ইং]
ইরান সিরিয়া ও সুদান পরিস্থিতি কোন দিকে	[প্রকাশ ঃ১১. ১০. ২০০৪ইং]

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ মাওলানা কিসমতী রচিত ইসলামী গ্রন্থ

মাওলানা কিসমতী রচিত উল্লেখযোগ্য ইসলামী গ্রন্থের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

- *আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা*, ই.ফা., ঢাকা, ২০০৬
- চিন্তাধারা, ই.ফা., ঢাকা, ১৯৮৮
- *বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ*, ই.ফা., ঢাকা, ১৯৮৮
- দার্শনিক শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা, ঢাকা, ২০০০

- উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস (অনু.), মূল : ড. প্রফেসর শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম, ই.ফা., ঢাকা, ২০০৪
- শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা, (অনু.), মূল : ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.), আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮
- আদর্শ কীভাবে প্রকাশ করতে হবে? (অনু.), মূল : আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঢাকা, ১৯৬৪
- শহীদে কারবালা : ইসলামী গণতন্ত্র আন্দোলনের পহেলা শহীদ, ঢাকা, ১৯৭৬
- আল কোরআনের দৃষ্টিতে সমাজসেবা, ই.ফা., ঢাকা, ১৯৮০
- এই সময় এই জীবন, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬
- আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা
- মানবতা বিধ্বংসী দু'টি মতবাদ
- মাযহাব সৃষ্টির গোড়ার কথা
- মহানবী (আংশিক অনু.) মূল : সৌদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খাতীব এর পিতা
- সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমান, মূল : রাবেতা-এ-আলমে ইসলামী প্রকাশিত 'আল মুসলিমূনা ফিল ইত্তেহাদীস্ সুফিয়াতী'

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, গবেষক, প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ছিলেন একাধারে সু-সাহিত্যিক, অধ্যাত্মিক সাধক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট, পত্রিকার সম্পাদক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি আমৃত্যু ধর্ম প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত থেকে বিভিন্ন সভা-সেমিনারের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে সংকট মুকাবিলার মুসলিম জাতির কি করণীয় সে বিষয়ে জ্ঞানগর্ব দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী ভাবধারায় জীবন-যাপন করার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে সে বিষয় লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেন। কলম সৈনিক হিসেবে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ২৬ খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর ভাবগুরু দূরদর্শী সাধক পুরুষ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমীর ন্যায় এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক বিষয়াদি পাঠ্যভুক্ত করা, মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহর দ্বীনের শিক্ষা আদর্শ বিস্তার ও এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দানের উপযোগী লোক তৈরীর প্রবল আকাঙ্খা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মুসলিম জাতির ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে উন্নত চেতনা বোধ জাগ্রত করে অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে কলম তুলে ধরেছেন। ইসলামী চিন্তাচেতনার আলোকে সাহিত্য সংস্কারের প্রয়াস চালিয়ে সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও দিক নির্দেশনা তুলে ধরে মানুষের মাঝে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের মাঝে জনপ্রিয় ও আধুনিক করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লেখেন। তিনি সাংগঠনিকভাবে দক্ষ থাকার কারণে রাজপথে ছিলেন অকুতোভয় লড়াকু সৈনিক। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সত্যের সৈনিক হিসেবে লেখনির ময়দানে ছিলেন সোচ্চার।

মাওলানা কিসমতীর পারিবারিক জীবন ছিল খুবই সু-শৃঙ্খল। তাঁর সন্তানেরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। পরিবারের সকল সদস্য তাঁকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন। অভিভাবক হিসেবে তিনি ছিলেন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

মাওলানা কিসমতী সাংবাদিকতার জগতে ছিলেন এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখতেন। সমাজের বিভিন্ন বিষয় তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠতো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রায় ৩০০০টি প্রবন্ধ লিখেছেন যা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বহু প্রতিভার অধিকারী ক্ষণজন্মা এ মনীষীর জীবন পরবর্তীদের জন্য এক বিরাট পাথেয় বলেই আমি মনি করি। মাওলানা কিসমতীর জীবন ও আরবী ও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতা দেশ ও জাতির এক মূল্যবান সম্পদ।

একটি আদর্শবাদী সুন্দর সভ্য টেকসই সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর পরিকল্পনা, চিন্তা-দর্শন, চেতনা ও দিকনির্দেশনা কার্যকরি ফলপ্রসূ রাখতে সক্ষম। সুশীল সমাজ বিণির্মানের জন্য কিছু সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হল:

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীর মত বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিকের পরিচয়, তাঁর সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন দিক ও সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন তা সমগ্র মানব জাতিকে অবহিত করা এবং তার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করা যেত পারে। তাঁর সম্পর্কে গবেষণাকৃত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রিন্ট, মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সকল গণমাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে অবহিত করা যেতে পারে। স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত করে চেতনরাবোধ জাগ্রত করে যুব সমাজের চারিত্রিক মানোন্নয়ের উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর রচিত বইগুলোকে সিলেবাসভুক্ত করা যেতে পারে।

মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সম্পর্কে এটাই প্রথম প্রচেষ্টা তাঁর জীবনের সকল তথ্য সন্নিবেশ করতে সকল দুর্বলতা উপেক্ষা করে আমি সচেষ্ট ছিলাম, আশা করি এ বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণা হবে এবং যুগ যুগ ধরে চলার পথের পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ আমাদের কর্ম প্রচেষ্টা ও আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নে তাওফীক দিন। – আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

- আল কুরআন
- আল হাদিস
- আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা, ই.ফা, ঢাকা, ২০০৬
- আদর্শ কীভাবে প্রকাশ করতে হবে, (অনু.), মূল : আবু সালীম মুহাম্মদ আবদুল হাই, ঢাকা, ১৯৬৪
- আল কোরআনের দৃষ্টিতে সমাজসেবা, ই.ফা, ঢাকা, ১৯৮০
- আল উম্মাতুল মুসলিমা ওয়াল্লুগাতুল আরাবিয়া
- আধুনিক মুসলিম মনীষী, অধ্যাপক মোঃ আবদুল লতিফ, ঢাকা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ২০০৪ ।
- আমাদের শিক্ষা কোন পথে? আবদুল্লাহ আল মুতি, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৬ ।
- আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মাওলানা আবদুস সাত্তার, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮০ ।
- আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ঢাকা,বারকো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৭৫ ।
- আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, গোলাম সামদানী কোরায়শী, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭ ।
- ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র, ঢাকা, ১৯৬৯
- উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস (অনু.), মূল : ড. প্রফেসর শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম, ঢাকা, ই.ফা., ২০০৪
- এই সময় এই জীবন, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬
- কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্রের অন্তরালে, ঢাকা, ১৯৭০
- কুরআন পরিচিতি, ড. মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা, নূবালা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ ।
- চিন্তাধারা, ই.ফা., ঢাকা, ১৯৮৮
- তাজকিরাতুল আওলিয়া, মাওলানা নুরুর রহমান, ঢাকা,এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭ ।
- দার্শনিক শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা, ঢাকা, ২০০০
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মনিরুজ্জামান, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ।

- বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ, ঢাকা, ই.ফা., ১৯৮৮ ।
- বিষয় সাংবাদিকতা, ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, লিপিকা প্রকাশনী, ২০০৩ ।
- বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক অভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৩ ।
- বাংলাদেশের সূফী সাধক, ড. গোলাম সাকলাইন, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ।
- বাংলাদেশে ইসলাম, আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা,আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ ।
- বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ ।
- বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনুঃ), ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮২ ।
- বাংলার মুসলমানদেও ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), এম.এ.রহিম, ঢাকা, নুরজাহান রহিম, ১৯৭৬ ।
- বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সুব্রত শংকর ধর, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬ ।
- বিষয়: সাংবাদিকতা, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, ঢাকা, সুবর্ণ, ২০০০ ।ং
- বাঙালি মুসলমানদের আলোকবর্তিকা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ ।
- বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা প্রীতি, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ।
- বাংলা পিডিয়া, সম্পা সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ ।
- বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, অধ্যাপক মজির উদ্দিন, ঢাকা, দিদরি পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৭ ।
- ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ড. আবদুল করিম, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯ ।
- মহানবী (আংশিক অনু.) মূল : সৌদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খাতীব এর পিতা
- মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ডক্টর মুহাম্মতদ এনামুল হক, ঢাকা,মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮ ।
- মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ।

- মুসলিম সাহিত্য প্রতিভা, হেলাল মোঃ আবু তাহের, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ।

মাদরাসা শিক্ষা-বাংলাদেশ, আবদুল হক ফরিদী, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ ।

- সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ ।
- সাংবাদিকতা: শিকড় থেকে শিখর, শাহেদত জাহিদী, ঢাকা,পলল প্রকাশনী, ২০০৯ ।
- সাংবাদিকের রোজনামচা, মোহাম্মদ মোদাব্বের,ঢাকা, বর্ণ মিছিল, ১৯৭৭ ।
- সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমান, মূল : রাবেতা-এ-আলমে ইসলামী প্রকাশিত 'আল মুসলিমূনা ফিল ইত্তেহাদীস্ সুফিয়াতী'
- সাহিত্যের সীমানা, মুজিবুর রহমান খাঁ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, দ্বিতীয় প্রকাশ ।
- শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা, (অনু.), মূল : ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.), ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৮
- শহীদে কারবালা : ইসলামী গণতন্ত্র আন্দোলনের পহেলা শহীদ, ঢাকা, ১৯৭৬
- শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা, খায়রুল প্রকাশনী,